দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা।। ৩ মার্চ - ২০১৪।।
১৮ ফাল্গুন - ১৪২০।। website : www.eswastika.com

WORLD

CARDINALS DIVIDED OVER WHO SHOULD BE

47 Hindu temples, 700 homes attacked across Bangladesh

Islamic activists have been targeting Hindu shrines and homes after a top leader of the nation's largest Islamic party was given death penalty for 1971 war crimes last month

DHAKA Islamic activists have attacked dozens of Hindu temples and hundreds of homes across Bangladesh since an Islamist leader was sentenced to death for war crimes last month, a Hindu group said on Wednesday.

Bangladesh Puja Udjapon Parishad, a group which looks after Hindu temples, said 47 temples and at least 700 Hindu houses had either been torched or vandalised since the verdict against Delwar Hossain Sayedee.

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন

নিরন্তর.. নির্বিবাদে...

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

মোদী ছাড়া দেশের কোনো ভাবী প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা ও অসমে যাননি □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : শুধু হাওয়াই চটিই দেখলেন আন্না ? কান্না শুনলেন না ? □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

ইসলাম-বিরোধী 'মুসলিম' জেহাদ □ ড: গোপেশ চন্দ্র সরকার □ ১২

বাংলাদেশ সম্পূর্ণ হিন্দু উচ্ছেদের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে □ বিমল প্রামাণিক □ ১৪

ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের কাছে উদ্বাস্তুদের ন্যায়বিচার পাওয়া দূরঅস্ত □ অসিত বরণ ঠাকুর □ ১৭

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন ও বাঙালি সেকুলার বুদ্ধিজীবী □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ২০

স্বর্গে অদ্ভুত দাতা □ উমারানি বন্দ্যোপাধ্যায় □ ২১

পৌরাণিক নগর 'দ্বারকা' □ গোপাল চক্রবর্তী □ ২২

বৈদিক গণিত □ প্রাণতোষ বর্ধন □ ২৩

সি পি এম নিশ্চিত ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলা কি উঠছে? □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ২৭

তামিলনাড়ুর মহিলারা ভারতীয় পারিবারিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারে সংকল্পবদ্ধ □ ২৯

হিন্দুত্ব রক্ষায় চাই তাত্ত্বিক ক্ষত্রিয় □ অমলেশ মিশ্র □ ৩১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃ: ১৪-১৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অঙ্গনা : ২৬ □ □ অন্যরকম : ৩৩ □

পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬ □ □ খেলা : ৩৯ □

শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ১৮ ফাল্গুন , ১৪২০ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৫, ৩ মার্চ - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শ্রীচৈতন্যের সাম্যবাদ

প্রচলিত রাজনৈতিক মতাদর্শগুলির মধ্যে একটি মতবাদের নাম 'সাম্যবাদ'। এই সাম্যবাদ যেভাবে ব্যাখ্যাত হয় শ্রীচৈতন্য সেই ধরনের সাম্যবাদী ছিলেন না। তাঁর সাম্যবাদ ছিল একীভূত হওয়া অর্থাৎ সমরসতা। দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি উপলক্ষে এবারের বিষয় : শ্রীচৈতন্যের সাম্যবাদ। লিখেছেন— **অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়**।

এছাড়াও বিজ্ঞানের আলোয় দোল ও দীপাবলি নিয়ে লিখেছেন **সৌমেন নিয়োগী**।

দাম একই থাকছে— ১০ টাকা মাত্র। সত্বর কপি বুক করুন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নবগঠিত রাজ্য তেলেঙ্গানা

দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর দেশের ২৯তম রাজ্য হিসাবে তেলেঙ্গানা আত্মপ্রকাশ করিল। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র আমলে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় ও উত্তরাখণ্ড রাজ্য গঠনের ১৩ বছর পর এই তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠিত হইল। পার্থক্য এই—যে দীর্ঘদিন রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়া তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠিত হইল, আগের তিনটি রাজ্যের সেই ইতিহাস নাই। দেশের রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করিয়াই আগের তিনটি রাজ্য গঠিত হইয়াছিল।

আমাদের একটি কথা সর্বদাই স্মরণে রাখিতে হইবে যে আমরা হিন্দুস্থানের অধিবাসী। সমগ্র ভারতবর্ষই আমাদের দেশ। প্রাচীন ভারতেও বহু রাজ্য বা জনপদ ছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করিয়া এক একটি রাজ্য বা জনপদ গঠিত হইত। বর্তমানেও বিকাশ বা উন্নয়ন, ব্যবস্থা বা পরিকাঠামো, সুরক্ষা ও স্বয়ম্ভরতা—এই চারটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এক-দুইটি কেন, দুইশত রাজ্যও তৈরি হইতে পারে। কিন্তু এখন যাহা হইতেছে তাহা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির দিকে তাকাইয়াই হইতেছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এখন নূতন তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইল। মুখে ইমোশনাল ইন্ট্রিগেশান' বা আবেগাত্মক একতার কথা বলিলেও বাস্তবে ইহার কোনো প্রতিফলন নাই। বস্তুত এই রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত দুই বছর পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দলীয় রাজনৈতিক লাভক্ষতির বিচার করিয়া তাহা করা হয় নাই। বরং সেখানকার জনতাকে হিংসাত্মক আন্দোলনে প্ররোচিত করা হইয়াছিল। গত দুই বছরের তেলেঙ্গানা এলাকার বিভিন্ন ঘটনাই ইহার প্রমাণ।

বস্তুতঃ কোনও রাজ্য গঠন জনতার চাহিদা বা আবেগের উপর তখনই নির্ভর করে যখন বিকাশ, পরিকাঠামো, সুরক্ষা ও স্বয়ম্ভরতা— এই চারটি শর্ত পূরণ হইয়া থাকে। নূতন রাজ্য গঠনের সময় তাহার বিকাশের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করা যাইতেই পারে। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এইক্ষেত্রে খণ্ডিত অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যটির জন্য বিপুল আর্থিক প্যাকেজের দাবিও জানাইয়াছে। ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং বলিয়াছেন, রাজ্য ভাগের পর অন্ধ্রকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দান করিয়া আর্থিক সাহায্য করিবে কেন্দ্র। ঘটনা হইল, ভবিষ্যতে নবগঠিত রাজ্য যদি কেন্দ্রের সাহয্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকে, যেমন হইয়াছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে, তাহা হইলে রাজ্য গঠনের জন্যই রাজ্য গঠন হয়, তাহার বিশেষ কোনো সার্থকতা থাকে না। বোঝার উপর শাকের আঁটি হইয়া পড়ে। একটি নূতন রাজ্য গঠন তখনই সার্থক হয়, যখন সেই রাজ্যটি দেশের সার্বিক বিকাশে কোনো অবদান রাখিতে পারে। ক্রমশঃ প্রাপক হইতে দাতার যোগ্যতা অর্জন করে।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। নবগঠিত তেলেঙ্গানা রাজ্যকে তিনটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে হইবে। প্রথমত, নকশালবাদ বা মাওবাদ। উপকূলবর্তী অন্ধ্রে এই সমস্যাকে কিছুটা আয়ত্তে আনা যাইলেও নূতন রাজ্য তেলেঙ্গানাকে মাওবাদীদের মোকাবিলা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, জেহাদি বা সন্ত্রাসবাদী সমস্যার মোকাবিলা করিতে হইবে এবং তৃতীয়ত, রাজ্যের মানুষের, বিশেষত জনজাতিদের অজ্ঞতা ও দারিদ্রের সুযোগ লইয়া যে ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া চলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাতে তাহাদের ধর্মান্তরকরণ করিতে না পারে সেদিকে প্রশাসনকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সর্বোপরি, এই বিভাজন যাহাতে কোনো কটুতা বা পারস্পরিক মনোমালিন্য সৃষ্টি করিতে না পারে, তাহাও দেখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, আমরা একই দেশের অধিবাসী, যদিও প্রয়োজনের স্বার্থে অন্ধ্রপ্রদেশকে ভাঙিয়া এখন নূতন রাজ্য তেলেঙ্গানা গঠিত হইয়াছে—এই মাত্র।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কী করেছিস বল দেখি?" আত্মাকে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সংবাদ প্রতিবেদন

সিন্দেকে চিঠি পুরোহিতের

মিথ্যা মামলার ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান ভেদ করবেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্দে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের লিখে পাঠিয়েছিলেন যাতে সন্ত্রাস চালানোর মিথ্যা অভিযোগে ফেঁসে যাওয়া একজন নির্দোষ মুসলমানও বিনা বিচারে আটক না থাকেন তা সুনিশ্চিত করতে। এমনকী 'ভ্রান্ত গ্রেপ্তারে'র অভিযোগে অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেইসঙ্গে যাদেরকে 'ভুলভাবে গ্রেপ্তার' করা হয়েছে (পড়ুন মুসলমানদের) তাদের মুক্তি, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দায়িত্বও নিতে বলেছিলেন তিনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮-এ মালেগাঁও বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্ত লেফট্যানেন্ট কর্নেল প্রসাদ পুরোহিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান প্রভেদ না করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই মুক্তি দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। আরও বলেছেন ভ্রান্ত কারণে গ্রেপ্তার হওয়া মুসলমান যুবকরাই কেবল সরকারের সাহায্য পাচ্ছেন। অন্যান্যরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সম্প্রতি পুরোহিতের চিঠিটি সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে প্রকাশ্যে এসেছে।

পুরোহিত

সিন্দে

তথ্যাভিজ্ঞমহল স্পষ্টতই মনে করছেন যে কেন্দ্র 'নির্দোষ' আখ্যা দিয়ে সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত যেসব মুসলিম যুবকদের 'মুক্তি' দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে তাদের মধ্যে আদৌ কেউ 'নির্দোষ' আছে কিনা সন্দেহ। একদিকে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক অন্যদিকে এই মুসলিম দুষ্কৃতীদের কাজে লাগিয়ে শাসন-ক্ষমতা কায়েম রাখতেই মূলত এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তাঁদের অভিমত। এর উল্টোপিঠে যেটা থাকে সেটা হলো মুসলমানদের খুশি করতে হিন্দুদের মিথ্যা অভিযোগ ফাঁসানো ও বিনা বিচারে আটক রাখা। সুতরাং কেন্দ্র ও মুসলমান তোষণকারী রাজ্য সরকারগুলির এই বিপরীতমুখী কৌশলের মুখে পড়ে পুরোহিতের এই চিঠি যে কাকস্য পরিবেদনা ছাড়া আর কিছু নয়, তেমনটাই ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য রাজ্যগুলিকে ওইটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি সন্ত্রাস-সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যে রাজ্যে 'বিশেষ আদালত' গঠনেও উদ্যোগী হয়েছেন এবং অন্যান্য মামলার চেয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করে মুসলমান অপরাধীদের মুক্তি দেবার তদবিরও করেছেন।

নবি মুম্বইয়ের অলোজা কেন্দ্রীয় জেল থেকে লেখা আট পাতার চিঠিতে পুরোহিত অভিযোগ করেছেন, তাঁর ট্রায়াল গত পাঁচ-ছ'বছরে একবিন্দুও এগোয়নি। মহারাষ্ট্রের অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়ার্ড ও জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এন আই এ উভয়েই যে বিচারকে বিলম্বিত করছে সেই অভিযোগও করেছেন তিনি। সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক ছিলেন পুরোহিত। তাই তাঁর বিচার যাতে সেনা আইন মোতাবেকেই হয় সেজন্যে তাঁর স্ত্রী অপর্ণা রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্প্রতি সাক্ষাৎ করেছেন। রাষ্ট্রপতি একইসঙ্গে দেশের সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ নির্দেশদাতাও (সুপ্রিম কম্যান্ডার) বটে। পুরোহিত শ্রীসিন্দেকে যে চিঠিখানি লিখেছেন তার মোদ্দা কথা, মালেগাঁও বিস্ফোরণে নিষিদ্ধ ইসলামিক ছাত্র সংগঠন সিমি-র হাত থাকতে পারে। কিন্তু কয়েকটি সংবাদমাধ্যম ও রাজনৈতিক সংগঠনের চক্রান্তে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই নানাভাবে বিভিন্নজনকে ফাঁসানো হয়েছে। কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে পুরোহিত এত অভিযোগ নিবেদন করেছেন, তিনি নিজেই সেই চক্রীদের অংশ হওয়ায় সুরাহার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিস্ফোরকের সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার পাক-জঙ্গিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'ইমাম সাহার' কিংবা 'বাদাম রোগান'-এর নাম শুনেছেন? বা ধরুন 'চানজেনখান' অথবা 'হালাকু খানে'র নাম? 'কলমি সোরা'র নামও সম্ভবত শোনেননি। এগুলো কোনও খাবারের নাম নয়, কোনও ব্যক্তির নাম নয়। মায় কোনও জায়গারও নাম নয়। এগুলি আসলে বিস্ফোরকের নাম। পৃথিবীর কোনও ভাষা-অভিধান কিংবা বিজ্ঞান-অভিধানে এহেন নামের হদিশ না মিললেও লস্কর-ই- তৈবার সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপে এদের সন্ধান বিলকুল মিলবে। 'ইমাম সাহার' হলো পটাশিয়াম ক্লোরেট, 'বাদাম রোগান' হলো নাইট্রোবেনজিন, 'চানজেন খান' হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রোক্লোরেট, 'হালাকু খান' আসলে ম্যাগনেশিয়াম এবং 'কলমি সোরা' হলো অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। এবার বিষয়টা বোঝা গেল? গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিতে লস্করের নতুন চাল—মারাত্মক বিস্ফোরক- উপাদানের ছদ্মনাম বা 'কোড' (সংকেত) ব্যবহার।

সম্প্রতি দিল্লী পুলিশ লস্কর কম্যান্ডার আবদুল করিম তুণ্ডার বিরুদ্ধে যে চার্জশিট দাখিল করেছে তাতে এই বিষয়টি উঠে এসেছে।

গোয়েন্দা সূত্রের খবর এই সাংকেতিক নামগুলো মূলত প্রশিক্ষণ, অপারেশনের সময় ও পারস্পরিক কথাবার্তার সময় লস্কর জঙ্গিরা এই সাংকেতিক নামগুলি ব্যবহার করত যাতে গোয়েন্দারা বিষয়টি বুঝতে না পারেন। এই বিস্ফোরক-পদার্থগুলি দেশের নানাপ্রান্তে গত প্রায় দু'দশক ধরে বিভিন্ন বিস্ফোরণ কাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও পটাশিয়াম ক্লোরেট বোমা সিরিয়াল বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল। পরে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও এর ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো। এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটিতে রয়েছে বহু বোমা- বিশেষজ্ঞ

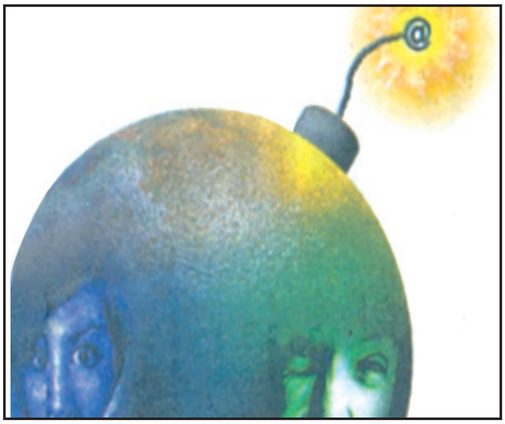

এমনকী গত বছর গ্রেপ্তার হওয়া সেই তুণ্ডা, সে নিজেও ছিল বোমা-তৈরিতে পারদর্শী, পাকিস্তানে লস্করজঙ্গিদের বোমা তৈরিতে প্রশিক্ষণ দেওয়াই ছিল তার কাজ।

চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, তুণ্ডা লস্কর-জঙ্গি মহম্মদ আমির ওরফে কামরানকে ভারতে পাঠিয়েছিল তার সমস্ত কাজের বিবরণ সাংকেতিক ভাষার মাধ্যমে দিয়ে। এই সাংকেতিক ভাষায় মূলত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কর্মকর্তাদের ভারতের ঠিকানা ও ফোন নম্বর, পাকিস্তানের যোগাযোগ নম্বর, ভারতের শহরগুলির পিনকোড এবং বোমা তৈরির সূত্র দেওয়া হয়েছিল বলে চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রে আরও খবর, এই সাংকেতিক ভাষা পাকিস্তান- কেন্দ্রিক জঙ্গিরা প্রায়শই পাল্টায় যাতে আই বি, 'র'-এর মতো সংস্থাগুলিকে বিভ্রান্ত করা যায়। জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি মূলত মানুষ কিংবা জায়গার নাম, অথবা চলচ্চিত্র, বই, খাবার বা বিখ্যাতদের নাম ব্যবহার করছে তাদের সাংকেতিক পরিভাষা হিসেবে।

সিমি আবার নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের অখণ্ডতা ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিমি)-কে গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে আবার ৫ বছরের জন্য বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আর পি এন সিংহ রাজ্যসভায় জানিয়েছেন যে, সিমির গতিবিধির বিষয়ে সমস্ত রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও তদন্ত এজেন্সিগুলি থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সিমির কার্যকলাপ দেশের অখণ্ডতা ও সুরক্ষার পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক এবং শান্তি ও সৌহার্দ্যে বাধা উৎপন্নকারী। সেইসঙ্গে সিমি দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতির পরিবেশও নষ্ট করছে। শ্রী সিংহ আরো জানান, অনেক রাজ্য এবং এন আই এ-র পক্ষ থেকে সিমির ক্যাডারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং অপরাধ প্রমাণিতও হয়েছে। ড. পি কে রামলিঙ্গমের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে শ্রী সিংহ জানান, কেন্দ্র সরকার 'বেআইনি গতিবিধি নিরোধক আইন— ১৯৬৭' অনুসারে ৫ বছরের জন্য আবার সিমিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ভিশন ২০২০—দেশের অর্থনীতিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পরিকল্পনা বিজেপি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দেশবাসী তাঁদের ক্ষমতায় বসালে ‘শক্ত ও সমর্থ ভারতবর্ষ’ গঠন করতে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিজেপি। দেশের ‘আরও উৎসাহপূর্ণ বাজারকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠন’-এর মাধ্যম বার্ষিক বৃদ্ধি অন্তত ১২ শতাংশ করার স্বপ্ন দেখছে বিজেপি। বিজেপি শাসিত সরকার একইসঙ্গে আন্ত-রাজ্য ‘অর্থনৈতিক বাধা’ ভেঙে একটি ‘জাতীয়-বাজার’ তৈরি করতে চাইবে। আন্ত-রাজ্য আন্দোলনে বিক্রয় কর ইত্যাদির ক্ষেত্রে ‘কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত বিধিনিষেধ’ একেবারে তুলে দেওয়া হবে বলে পার্টির অর্থনৈতিক সেল সূত্রের খবর। পার্টির তরফ থেকেই প্রস্তাব করা হয়েছে যে জাতীয় স্তরে ‘সঞ্চয়’কে উৎসাহ দেওয়া হবে এবং প্রতি মাসে লক্ষ টাকার (অর্থাৎ বছরে বারো লক্ষ) কম রোজগারকারীকে ‘করমুক্ত’ করা হবে। কিন্তু এতে সরকারের আয় কি কমে যাবে না? বিজেপি-র অর্থনৈতিক উপদেষ্টারা বলছেন, এই আয় যাতে না কমে সেইজন্য ‘জাতীয় উৎসকে নিলাম’ করা হবে। এবং এর ফলে সমস্ত ধরনের ‘সঞ্চয়’কে ‘করমুক্ত’ করলেও সরকার সেটা পুষিয়ে নিতে পারবে।

এই যাবতীয় ‘অর্থনৈতিক প্রস্তাব’ আদতে বিজেপি-র ‘২০২০ ভিশনে’রই অঙ্গীভূত। এটি বর্তমান ‘অর্থনৈতিক মডেল’-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমান মডেলটি যে আধুনিক অর্থনীতির পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত তা উপলব্ধি করেই ‘আক্রমণাত্মক বাজার অর্থনীতি’ অন্তত রাষ্ট্রীয় স্তরে গ্রহণ করতে চাইবে বিজেপি সরকার। প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকরির বাড়িতে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বিজেপি-র ‘ভিশন ২০২০’ উপসমিতির সদস্যরা এক বৈঠকে মিলিত হন। এই সমিতির আহ্বায়ক ড. সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী ছাড়াও দলের বরিষ্ঠ নেতৃত্ব সেই বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকে ‘অর্থ-ক্রান্তি’ নামে একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক থিঙ্ক ট্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা ছাড়াও জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির হয়ে কাজ করা কিছু বিশিষ্ট মানুষও এতে যোগদান করেছিলেন। সব মিলিয়ে দেশকে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর দাঁড় করাতে বিজেপি যে আটঘাট বেধেই এগোচ্ছে তা পরিষ্কার। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই পার্টির ‘প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক খসড়া’ তৈরি হয়ে যাবে বলে সূত্রের খবর।

বিজেপি-র তিন কিস্তি

(১) বছরে ১২ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধি সংঘটিত করে আমেরিকা ও চীনের সঙ্গে একাসনে ভারতকে ২০২০ সালের মধ্যে বসানো। এবং এটা পরবর্তী দু’দশকের মধ্যে চীনকে অতিক্রম করে যেতেও সাহায্য করবে।

(২) জাতীয় স্তরে ‘সঞ্চয়’-কে উৎসাহিত করতে এবং বছরে ১২ লক্ষ টাকার কম রোজগারকারীদের ‘কর ছাড়ে’র সুযোগ দিতে চাইছে দল।

(৩) ‘প্রশাসনিক দক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা’ বাড়াতে সার্বিক ‘দ্বিতীয় জেনারেশন পুনর্গঠন’-এর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে পার্টির ২০২০ ভিশন দলিলের অর্থনৈতিক অধ্যায়।

এই ভিশন-তথ্যাবলীর অর্থনৈতিক অংশে আপাদমস্তক ‘দ্বিতীয় জেনারেশন পুনর্গঠন’-এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যাতে ‘প্রশাসনিক দক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা’ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে খোলা প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি তার বাড়বাড়ন্ত চরিত্র ধরে রাখতে পারবে বলে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। তাঁরা এও মনে করছেন যে এই বৃদ্ধি যদি বিজেপি সরকার সত্যিই সম্ভবপর করতে পারে তবে ‘বিশ্বের সর্বোচ্চ তিনটি দেশের লীগে’ ভারত ঠাঁই করে নেবে। অবশ্য এর জন্য প্রশাসনিক নিয়মাবলী সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। বিজেপি-র ২০২০ ভিশন প্রস্তাবিত খসড়ায় এমনটাই লিখেছেন সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী। দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতায় এব্যাপারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেলবন্ধনের কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন। দলের অর্থনৈতিক দলিলের খসড়ায় এব্যাপারে মোক্ষম যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়েছে যে বছরে বারো শতাংশ করে জিডিপি বৃদ্ধির অর্থ প্রতি ছ’ বছরে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ হবেই এবং প্রত্যেক সাত বছরে দেশের মানুষের রোজগারও বাড়বে দ্বিগুণ। তবে এর সুফল যাতে প্রত্যেকটি দেশবাসী পান তা সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রকল্পও ভাবা আছে বিজেপি-র থিঙ্ক-ট্যাঙ্কের। এই বৃদ্ধি সম্ভবপর হলে ২০১০-র মধ্যেই ভারত আমেরিকা ও চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় চলে আসতে পারবে এবং আগামী দু’ দশকে চীনকেও এ বিষয়ে ছাপিয়ে যেতে পারবে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন।

তাঁরা এও মনে করছেন ভারত এই মুহূর্তে মোটেও অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নশীল দেশ নয় এবং সেই কারণেই আগামী এক দশক বার্ষিক জিডিপি-র হার অন্তত বারো শতাংশ প্রতি বছর রাখা দরকার। বিদেশি বিনিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ শিল্পে তথ্য-প্রযুক্তি সফটওয়্যারের ব্যবহার এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সহায়ক হবে বলে বিশেষজ্ঞদের আশা। তবে গত এক দশকে দেশব্যাপী দুর্নীতি যেভাবে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে কালিমালিপ্ত করেছে তাতে এর বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারে বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাদের অনেক মেহনত করতে হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে উচ্চ শিক্ষায় বার্ষিক জিডিপি ২.৮ শতাংশ ব্যয়িত হয়, তা অন্তত ৬ শতাংশ করা হবে বলে বিজেপি-র অর্থনৈতিক উপদেষ্টারা জানিয়েছেন।

মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ খসে পড়ল আপ-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অরবিন্দ কেজরিওয়াল-এর আম আদমি পার্টির ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে পড়েছে। সম্প্রতি কয়েকটি উর্দু সংবাদপত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে যেখানে ওয়াশিংটনের 'অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান মুসলিম অফ আমেরিকা' নামে একটি সংগঠন আম আদমি পার্টিকে সমর্থনের জন্য মুসলিমদের ব্যাপক অভিযান চালাতে বলেছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আপ পার্টির প্রার্থীকে জেতানোর জন্য অর্থ সংগ্রহের কথাও বলা হয়েছে।

দিল্লী থেকে প্রকাশিত মিল্লি গেজেটি (Milli Gazette) গত ১ ফেব্রুয়ারি (২০১৪) সংখ্যায় একটি পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে এই বিজ্ঞাপন ছেপেছে। আপ পার্টির প্রতীক ঝাঁটা হাতে কেজরিওয়ালের একটি ছবি এই বিজ্ঞাপনে রয়েছে। কেজরিওয়ালের

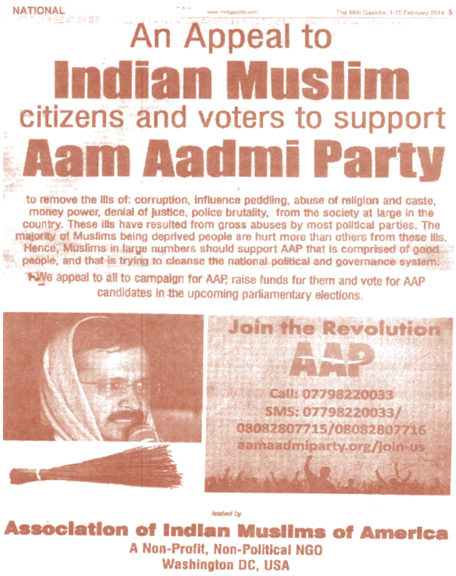

আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও আপ পার্টিতে যোগ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। যোগাযোগের সূত্র হিসেবে কয়েকটি টেলিফোন নাম্বারও দেওয়া হয়েছে, যেমন, ০৭৭৯৮২২০০৩৩। এছাড়া এস এম এস করার জন্য আরও কয়েকটি ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে। ওয়েবসাইট-ও আছে।

বিজ্ঞাপনের শিরোনাম হলো--- 'মুসলিম নাগরিক ও ভোটারদের কাছে আবেদন।' আপ পার্টিকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, 'মুসলিমদের বেশির ভাগই বঞ্চিত, অন্যদের তুলনায় তাদের বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয়। তাই মুসলিমদের দলে দলে আপ পার্টিকে ভোট দেওয়া দরকার, কেননা সেই দলে কিছু ভালো লোক আছে যারা ভারতীয় রাজনীতি ও প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার কাজ করছে। অন্যান্য দল ক্ষমতার অপব্যবহার করছে, তারাই দুর্নীতির বিষ ছড়াচ্ছে। তাই আপ পার্টিকে ভোট দিন।'

ভারতে ৬০০ লোকপিছু একটি এন-জি-ও

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশে সুশীল সমাজের আন্দোলন দুর্বল হওয়াই এন-জি-ও-র রমরমা চোখে পড়ার মতো। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর তথ্য অনুযায়ী ১২৫ কোটি জনসংখ্যার এই দেশে কমপক্ষেও ২০ লক্ষ এন-জি-ও তাদের কাজকর্ম চালাচ্ছে। এরা বেশিরভাগই আয়কর দপ্তরে কোনো হিসাবই দেয় না। পশ্চিমবঙ্গ-সহ বেশিরভাগ রাজ্য এন-জি-ও-গুলির যথাযথ পরিসংখ্যান ও তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে। মনকে নাড়া দেওয়ার মতো তথ্য হলো, দেশে প্রতি ৬০০ লোকপিছু ১টি করে এন-জি-ও আছে। এর সঙ্গে হালেই সরকারের দেওয়া পুলিশি তথ্যের তুলনা চলে। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রতি ৯৪০ লোকপিছু মাত্র ১ জন পুলিশ আছে।

এসব তথ্য পাওয়া যায়, যখন এক জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সারা দেশে এন-জি-ও সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে সিবিআই-কে দায়িত্ব দেয়। সিবিআই এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই সারা দেশে এন-জি-ও-গুলির কাজকর্ম খতিয়ে দেখেছে। বেশিরভাগ রাজ্য— অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, দিল্লী, হরিয়ানা, কর্ণাটক, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, ছত্তিশগড় ও হিমাচলপ্রদেশ— এন-জি-ও-র কাজকর্ম ও আয়ের উৎসের কোনো তথ্যই দিতে পারেনি। এইসব রাজ্য থেকে কোনো তথ্য না পেলেও সিবিআই-এর নিজস্ব তদন্তে ১৩ লক্ষ এন-জি-ও-র অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল। বাকি রাজ্যেও এন-জি-ও-র কমবেশি অস্তিত্ব অনুমান করে সি বি আই সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিল সারা দেশে এই সংখ্যা কমপক্ষে ২০ লক্ষের মতো হতে পারে। শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশেই ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ১৯৪টি এন-জি-ও কাজ চালাচ্ছে। এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস্-এর এক প্রশ্নের উত্তরে আর টি আই (রাইট টু ইনফরমেশন) জানাচ্ছে--- কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আলাদাভাবে ২০০২—০৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন এন-জি-ও-কে ৬৬৫৪ কোটি টাকা দিয়েছিল অর্থাৎ গড়ে বছরে ৯৫০ কোটি টাকা। ২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে— প্রায় ২২ হাজার এন-জি-ও মিলিতভাবে বিদেশ থেকে পেয়েছিল ২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। তার মধ্যে শুধুমাত্র আমেরিকা থেকে এসেছিল ৬৫০ মিলিয়ন ডলার। বিভিন্ন রাজ্য থেকে সি বি আই যতটুকু তথ্য সুপ্রিম কোর্টকে দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে--- বেশিরভাগই এন-জি-ও আয়কর দপ্তরে রিটার্ন জমা করে না।

মোদী ছাড়া দেশের কোনো ভাবী প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা ও অসমে যাননি

গূঢ়পুরুষের কলম

পঞ্চদশ লোকসভার মেয়াদ শেষ। শুরু হতে চলেছে ষোড়শ লোকসভার ৫৪৩টি আসনের জন্য দেশজুড়ে নির্বাচন। এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হয়ে মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন পাঁচ-ছয় দফায় হওয়ার কথা। এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে, তখন হয়তো কেন্দ্রীয় কমিশনের নোটিফিকেশন হয়ে যাবে। আর সেই সঙ্গে ভোটের প্রচারকে তুঙ্গে নিয়ে যাবে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলই। তাই ভারত জোড়া এই ভোটযুদ্ধের প্রাক্-মুহূর্তে একবার নজর দেওয়া দরকার জয় পরাজয়ের নিরিখে কারা এগিয়ে আছে। এই বিষয়ে দেশের সংবাদমাধ্যম একাধিকবার জনমত সমীক্ষা করেছে। বুদ্ধিজীবী গুণীজনেরা প্রতি সন্ধ্যায় টিভি চ্যানেলে চ্যানেলে তাঁদের মতামত দিচ্ছেন। কিন্তু ভোটের দিন শেষ কথাটি বোতাম টিপে বলবেন ভারতের সাধারণ মানুষ। তাঁদের বিভ্রান্ত করাটা সহজ নয়। সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত নেন। বিচার করেন ভাল মন্দের। রাজনৈতিক দলের প্রচারসভায় উপস্থিত থেকে অথবা টেলিভিশনে নেতা-নেত্রীদের বক্তব্য তাঁরা মন দিয়ে শোনেন। বিতর্কেও কেউ কেউ যোগ দেন। কিন্তু আবার বলছি, অরাজনৈতিক সাধারণ মানুষ নেতা-নেত্রীদের প্রতিশ্রুতিতে নয়, তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। যেমন, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে পশ্চিমবঙ্গকে আক্ষরিক অর্থেই 'সোনার বাংলা' করে দেবেন। যেমন তিনি কলকাতাকে লন্ডন বানিয়ে দিয়েছেন। রাজ্য প্রশাসনের প্রতিটি স্তর নাকি এখন দুর্নীতিমুক্ত। নারী নির্যাতন, রাজনৈতিক খুন ইত্যাদির গালগল্প কিছু গুলবাজ সাংবাদিক ফলাও করে লেখেন। নেত্রী তাই প্রতিদিনই বলেন, টিভির সংবাদ চ্যানেলগুলি দেখবেন না। দেখলে মস্তিষ্ক-দূষণ ঘটবে। সাধারণ মানুষ কী নেত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়েছেন? মোটেই নয়। কলকাতা যে লন্ডন হয়নি সবাই প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। কলকাতার সাধারণ মানুষ জানেন, পথে সরকারি বাসের টিকিটিও দেখা যায় না। যে দু'চারটি বেসরকারি বাস চলে তাতে চড়তে গেলে কোনও সার্কাস দলে ট্রেনিং নিতে হবে। মানুষ জানে, তৃণমূল দিদি আত্মপ্রচার ভালবাসেন। তিনি ফতোয়া দিয়েছেন, সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া সমস্ত সরকারি বিজ্ঞাপনে একমাত্র তাঁর ছবি বড় করে দিতে হবে। ভোটের প্রচারে দক্ষিণী রাজ্যের স্টাইলে তাঁর ছবির বড় বড় 'কাটআউট' দিয়ে মাঠ ঘাট ভরিয়ে দিতে হবে। এতে যে দৃশ্য-দূষণ হবে সেকথা সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যে না বললেও মনে মনে বিরক্ত হবেন। এবং সিদ্ধান্ত নেবেন। সাধারণ মানুষ মাত্রা ছাড়া আত্মগরিমা প্রচার পছন্দ করেন না। তাঁরা কাজ দেখে, বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে সিদ্ধান্ত নেন।

নরেন্দ্রভাই দামোদরভাই মোদী সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করেন। যথাযথ মর্যাদা দেন। তাই প্রতিটি জনসভায় তিনি বলছেন, দেশকে ভোট দিন। সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় ভোট দিন। উন্নয়নের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা সম্ভব। নেতা, নেত্রী, দল বিচার না করে কাজের মানুষকে ভোট দিন। অরুণাচল প্রদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন, 'ভারত চীনকে ভয় পায় না।' স্পষ্ট বলে দেন, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকলে ভারত আক্রমণের জন্য চীনকে সেদিন চরম মূল্য দিতে হোত। গত ২২ ফেব্রুয়ারি নরেন্দ্রভাই উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্য সফরে যান। এই সফরে তিনি অসমের শিলচরে, ত্রিপুরার আগরতলায় এবং অরুণাচলের পাহাড়ি শহর পাসিঘাটে জনসভা করেন। স্মরণকালে এত বিশাল জনসভা কেউ দেখেনি। সাধারণ মানুষের এমন বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসও অতীতে দেখা যায়নি।

অসমে নরেন্দ্রভাই কী বলেছেন ফের এক নজরে দেখা যাক। বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুরা অনুপ্রবেশকারী হতে পারেন না। তাঁরা শরণার্থী। তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব না দেওয়াটা অমানবিক, অন্যায়। পাকিস্তানে চরম নির্যাতিত হয়ে গুজরাট ও রাজস্থানে শরণ নেওয়া প্রতিটি হিন্দু পরিবারকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা প্রতিটি হিন্দু পরিবারকে দ্রুততার সঙ্গে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। শুধু বাংলাদেশ কেন, বিশ্বের যে কোনও দেশে নির্যাতনের শিকার হয়ে হিন্দুরা চলে এলে তাঁদের নাগরিকত্ব দেবে বিজেপি সরকার। পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এত বড় কথা বলতে পারেন সারা দেশে একমাত্র নরেন্দ্রভাই। অন্য দ্বিতীয় কেউ নয়। ত্রিপুরাবাসীকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'ভারত বিভাজনের সময় পাকিস্তান ত্রিপুরাকে গ্রাস করতে চেয়েছিল। সেদিন ত্রিপুরার মহারানি কাঞ্চনপ্রভা ছুটে যান গুজরাটের ভূমিপুত্র সরদার প্যাটেলের কাছে। প্যাটেলের দৃঢ়তায় ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।' দীর্ঘ বহু বছর কম্যুনিস্ট-শাসিত ত্রিপুরার নবপ্রজন্ম খবর রাখেন না যে এই কম্যুনিস্টরা ত্রিপুরাকে পাকিস্তানে যুক্ত করতে মুসলিম লিগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল। সেই দালাল কম্যুনিস্টদের গোলামি করতে ত্রিপুরার অরাজনৈতিক সাধারণ মানুষের লজ্জাবোধ করা উচিত। মোদী বলেছেন, 'আমি গর্বিত যে সরদার প্যাটেলের জন্মভূমিতে জন্মেছি'। তাঁরই কথার অনুসরণে বলি, 'আমরা গর্বিত, নরেন্দ্রভাই অরুণাচলপ্রদেশ এবং ত্রিপুরার মতো উপেক্ষিত দুই ছোট রাজ্যকে তাঁর সফর সূচিতে রেখেছেন।' অরুণাচলের ২টি ও ত্রিপুরার ২টি লোকসভা আসনের জন্য প্রচারে অতীতে দেশের কোনও ভাবী প্রধানমন্ত্রী যাননি। এখানেই তাঁর সঙ্গে অন্য নেতাদের পার্থক্য। এই জন্যই তিনি সর্বজনপ্রিয়।

শুধু হাওয়াই চটি-ই দেখলেন আন্না? কান্না শুনলেন না?

মাননীয় আন্না হাজারে
রামলীলা ময়দান, নয়াদিল্লী

আন্নাজী,

না, আপনার গ্রামের বাড়ি নয়, চিঠিটা পাঠালাম রামলীলা ময়দানেই। আমার মতো আপনার আম ভক্তরা ওই ঠিকানাতেই চেনে আপনাকে। সত্যি আপনার দুর্নীতি বিরোধী অনশন আন্দোলনের সময় দেশের অনেক যুবক যুবতীর মতো আমিও আপনার ভক্ত হয়ে উঠি। ইতিহাসে পড়া মানুষদের মতো মনে হয়েছিল আপনাকে। একটা মানুষ একা আওয়াজ তুলতেই দেশ জোড়া একটা আন্দোলনের জন্ম হয়ে গেল। সবাই তখন আন্না। টিভি, ফেসবুক, খবরের কাগজে দেখলাম এক আন্না অনেক হয়ে গেলেন। হাজারের ডাকে হাজারে হাজারে ছেলে মেয়ে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন দেশের প্রান্তে প্রান্তে। এক আন্নার ডাকে রাত অব্দি সংসদ চলতেও দেখলাম।

আজ কেন জানি না মনে হচ্ছে সেসব কি স্বপ্ন ছিল? নইলে কেন দেখলাম আন্না রাজনীতির কাছে বিক্রি হয়ে গেলেন? না আন্না, ভুল বুঝবেন না। ক্ষমা করবেন আন্না, আপনাকে বিক্রি হয়ে যাওয়া বলতে হচ্ছে বলে। কিন্তু সত্যিই কি তা হয়নি? আপনি শুধু হাওয়াই চটি দেখেই মানুষ চিনে নিলেন? একজনের জীবনযাপনের দেখানো অংশটা দেখেই বুঝে গেলেন তিনি দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতমা? সত্যিই আপনি সবটাই না জেনে করলেন আন্না? নাকি আপনি জেনে বুঝেই সব করলেন? এক অরবিন্দের কাছে দাগা খেয়েও আপনি মমতার হাত ধরলেন কেন?

আপনি আন্না বলেছেন, মমতা সাধারণ ঘরে থাকে। সাধারণ শাড়ি পড়ে। সাধারণ হাওয়াই চপ্পল পরে। এটাই যদি দেশ চালানোর জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি হয় তবে আন্না কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও যোগ্য বলতে হয়। তাঁরও ব্যক্তিগত জীবনযাপন মোটেই খুব দামি ছিল না। কিন্তু তাঁর দলের বাকিদের দুর্নীতির জন্যই নিশ্চয়ই তাঁকে আপনি ভালো চোখে দেখেন না। তবে দিদির হাওয়াই চটিতে মজলেন কেন? এই বাংলার স্লোগান কি আপনি শোনেননি? 'দিদির পায়ে হাওয়াই চটি, ভাইয়ের কামাই কোটি কোটি' ছড়া একটু কান পাতলেই শুনতে পেতেন। আর একটু তলিয়ে ভাবলেই বুঝতে পারতেন, দিদির গরিবিটা নিছকই এক সাজ। আপনি আন্না জানেন না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর স্পেশাল শাড়িটা কোনও চরকা কাটা সুতোয় তৈরি নয়। আপনি খেয়াল করলেই বুঝতে পারতেন দিদির হাত খরচ কোটি কোটি টাকা। হ্যাঁ, হাত খরচ কোটি কোটি টাকা। ইচ্ছে মতো দলীয় ক্লাবকে যা তিনি এক সন্ধ্যায় বিলিয়ে দেন। মদ খেয়ে প্রাণ হারালে ভোটের লোভে টাকা বিলোতে বলে দেন।

আর দুর্নীতির কথা শুনবেন? না সোজাসুজি কোনও অভিযোগ আনতে পারবে না কেউ। কারণ, তিনি দুর্নীতিটা শৈল্পিকভাবে করতে জানেন। যখন থেকে তিনি বুঝলেন দল বড় হচ্ছে এবার টাকা দরকার তখন থেকেই তিনি তুলি তুলে ধরলেন। ক্যানভাসে ইচ্ছে মতো রং বোলালেন। সেই রং করা ক্যানভাস প্রথমে মোসাহেবদের দিয়ে কিনিয়ে নিজেকে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন। তাঁর ছবি দামি হয়ে গেল। এবার শিল্পপতিদের থেকে টাকা আদায়ের অছিলায় হয়ে গেল ছবি বিক্রি। অনেকের নামই বলতে পারি। শুধু একজনের কথাই শুনুন। সুদীপ্ত সেন। বর্তমানে জেলবন্দি সুদীপ্ত সেন চিটফান্ড গড়ে সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকা তুলেছেন। আবার সেই টাকা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কিনে ঘর সাজিয়েছেন। যদিও কেনার প্রমাণ পাওয়া গেলেও সুদীপ্ত সেনের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী চিত্রিত কোনও ছবির হদিশ মেলেনি। অনেকে বলেন, ছবিও কেনেননি সুদীপ্ত সেন। কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে শুধু ছবি কেনার ভান করেছেন।

না, আর কিছু বলব না। কারণ এখন আপনি যেভাবে দিদিতে আপ্লুত যে এই ক্ষুদ্র আন্না ভক্তের কথা আপনার বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না। আপনি ভাববেন মিছি মিছি ভয় দেখাচ্ছি। তবে আন্না বলে রাখছি, এই মোহ আপনার শীঘ্রই কেটে যাবে। আপনি অচিরেই বুঝতে পারবেন কোন স্বৈরতান্ত্রিক দিদির হাত আপনি ধরেছেন। কিছু বলব না, বলব না করেও কয়েকটা কথা শুধু আন্না আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই। মানবাধিকার কমিশনের মুখ কেমন করে বন্ধ করতে হয় তা জানেন মমতা। কী করে অপছন্দের মানুষের গায়ে (কলেজ ছাত্রীও) মাওবাদী তকমা লাগাতে হয় তা জানেন মমতা। জানেন কী করে কামদুনির মতো ঘটনায় নির্যাতিতার গরিব পরিবারকে ভয় দেখিয়ে, পয়সা দিয়ে, চাকরি দিয়ে কিনে নেওয়া যায়।

না আন্না আর নয়। সব বলে দেব না। আপনি বুঝুন। আশা করি আপনার সঙ্গে লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। তবে আপনি যদি সত্যিই কোনও পরিকল্পনা (বিশ্বাস করতে খারাপ লাগছে) নিয়ে হাত মিলিয়ে থাকেন তবে বলার কিছুই নেই।

— সুন্দর মৌলিক

উত্তর সম্পাদকীয়

ইসলাম-বিরোধী 'মুসলিম' জেহাদ

ড. গোপেশ চন্দ্র সরকার

সত্যকে চিরকাল চেপে রাখা যায় না। ইসলামের যুক্তি নয়, বিশ্বাস- মূলক অবৈজ্ঞানিক এবং মানবতা বিরোধী তত্ত্বের বিরুদ্ধে আজ ক্রমশই জোরালো হচ্ছে প্রতিবাদী কণ্ঠ এবং সেটা শুধু হিন্দু নয়, যুক্তিবাদী, বিচক্ষণ উদারপন্থী মুসলিম সমাজের ভিতর থেকেও। স্যাটানিক ভার্সেস-খ্যাত সলমন রুশদি এবং তসলিমা নাসরিন ছাড়াও এই প্রতিবাদীদের তালিকা আজ ক্রমশই দীর্ঘায়িত হচ্ছে। ঢাকার বিখ্যাত কবি দাউদ হায়দার, আরজ আলি মাতুব্বর, জনাব আক্কেল আলি, জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরী, মুনতাসির মাসুন, শাহরিয়ার কবির, আবুল কাসেম, আলি সিনা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের খ্যাতনামা প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদরা আজ ইসলাম নয়, সক্রিয়ভাবে কলম ধরেছেন মানবতাবাদী সংস্কৃতির স্বপক্ষে। ইসলামি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, একদা গোঁড়া মোল্লাবাদী আনোয়ার শেখ মহোদয় আজ ইসলামের কঠোর সমালোচক হিসাবে বিশ্বের সারস্বত মহলে সুপরিচিত। তাঁর অন্তর্ভেদী প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো— ধর্মের নামে সারা পৃথিবীতে আরবীয় সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটানো। তাঁর যুক্তিভিত্তিক লেখা 'Islam : Sex and Violence' বইটি পড়লে ইসলামিক তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে পাঠক অনেক কিছুই জানতে পারবেন। ইসলামের মোল্লাবাদী গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন আরও একজন সমাজ-সচেতন বলিষ্ঠ সংগ্রামী লেখক মুর্শিদাবাদের জেলার জনাব গিয়াসুদ্দিন সাহেব। তাঁর মতে মুসলিম সমাজের এই অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া অবস্থার জন্য দায়ী মোল্লাবাদী শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা; আর দায়ী সেই সমস্ত ধান্দাবাজ রাজনৈতিক দল যাঁরা এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে কোটি কোটি টাকার আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করছেন--- শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফয়দা লাভের উদ্দেশ্যে। 'মুসলিম সমাজ এবং ফতোয়া সন্ত্রাস' গ্রন্থটির এই সাহসী লেখকের তীব্র সমালোচনা করেছে মোল্লাবাদী সমাজ। তাঁরা যুক্তির মোকাবিলা করতে না পেরে উল্টে প্রচার করছে— বিজেপি-র কাছে টাকা খেয়েই এমন গ্রন্থ রচনা করেছে গিয়াসুদ্দিন। কিন্তু নিরপেক্ষ যুক্তিবাদী পাঠকরা বইটি পড়লেই বুঝতে পারবেন— গিয়াসুদ্দিন সাহেবের বিশ্লেষণ মোটেই ভিত্তিহীন নয়। এই প্রসঙ্গে যে নামটি উল্লেখ না করলেই নয়, তিনি এক অসমসাহসী, কঠোর ইসলাম-বিরোধী বিদ্রোহী অগ্নিকন্যা--- বাংলাদেশের নূসরাত জাহান আয়েসা সিদ্দিকা— যিনি নিজেকে একদা রাজশাহীর বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হিন্দু রাজা কন্দর্পনারায়ণের ২৩তম বংশধর বলে দাবি করেন এবং মনের দিক থেকে যিনি আজও নিজেকে হিন্দুনারী 'জয়শ্রী আচার্য' হিসাবেই ভাবতে বেশি ভালবাসেন। তাঁর লেখা ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিবাদী, বিস্ফোরক 'ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার' নামক গ্রন্থে তাঁর প্রশ্ন--- বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হিন্দু সমাজের লোক যাঁরা একদিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা আজও কেন ওই মানবতা বিরোধী জেহাদি মতবাদকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন? তাঁরা কেন নারীসমাজ-সহ সর্বজন কল্যাণকারী উদার স্বধর্মে (হিন্দুধর্মে) এখনো ফিরে আসছেন না? তাঁরা কি নিজেদের ইতিহাসটাই ভুলে গেলেন? এই অসাধারণ গ্রন্থটি বিচারশীল প্রতিটি মানুষেরই অবশ্য পাঠ্য বলে আমার মনে হয়। তাঁর এই গ্রন্থে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য তিনি আরও একটি অসাধারণ তথ্যও পরিবেশন করেছেন। যে ইরানের আয়াতুল্লা খোমেনী একসময় সলমন রুশদির মুণ্ডচ্ছেদের ফতোয়া জারি করেছিলেন, ঈশ্বরের বিচিত্র লীলায় আজ সেই ইরানি বুদ্ধিজীবীদের একটি সচেতন অংশ ঘৃণাভরে ইসলাম পরিত্যাগ করেছেন এবং ২০১১ সালের জুন মাসে বিশ্বের মুসলিম সমাজের কাছে এই অমানবিক ধর্ম পরিত্যাগের জন্য, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জোরালো আহ্বানে জানিয়েছেন। ঘোষণা / আহ্বানপত্রটি নিম্নরূপ :

বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হিন্দু সমাজের লোক যাঁরা একদিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা আজও কেন ওই মানবতা বিরোধী জেহাদি মতবাদকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন? তাঁরা কেন নারীসমাজ-সহ সর্বজন কল্যাণকারী উদার স্বধর্মে (হিন্দুধর্মে) এখনো ফিরে আসছেন না? তাঁরা কি নিজেদের ইতিহাসটাই ভুলে গেলেন?

PROCLAMATION TO ABANDON ISLAM

We, the people of Iran and the world, regardless of our origins and beliefs, have come to the realization that it is not possible for a per-

son to be a Muslim and live by the standards of the United Nations Universal Declaration of Human Rights. We hold Islam in violation of the Universal Declaration of Human Rights, by invading other lands, enslaving people, destroying their heritage and their way of life. We find Islam guilty of pursuing a multifront attack, even to this day, on much of what is sacred to all civilized people. We consider Islam responsible for 1400 years of atrocities committed aganist the Iranian people and much of the Islamic world. We believe that Islam is the root of our problem, therefore, it must be abandoned.

Islam is not hijacked by the terrorists. The terrorists are the true Muslims. Muhammad bragged. I have been made victorious with terror [Bukhari : 4.52.220] He raided, massacred, looted and raped innocent people. Islam promotes hate, violence, misogyny, discrimination, intolerence, child abuse and murder.

For the love of humanity, for the peace of the world and for the future of our children, we denounce Islam. We urge Muslims to leave this faith of hate and join the rest of mankind in amity. We are one people, let not prophets of hate like Hitler, Marx and Muhammad divide us with their big lies. We invite you to sign this petition and promote it. Peace can not be attained unless hate is elinainated. Islam, like all ideologies of hate is the biggest impediment of peace.

অর্থাৎ আমরা যারা ইরান ও বিশ্বের মানুষ, আমাদের উৎস ও বিশ্বাস নির্বিশেষে এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছি যে একজন মানুষের পক্ষে মুসলিম হওয়া এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণা অনুযায়ী জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা লঙ্ঘন করেই আমরা— অন্যের জমি দখল করে, মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করে, তাদের ঐতিহ্য ও জীবনযাপন পদ্ধতিকে ধ্বংস করে ইসলামকে ধরে রেখেছি। আমরা দেখছি, ধারবাহিক বহুমুখী আক্রমণে ইসলাম দোষী, এমনকী আজও। ইরানের মানুষ ও ইসলামিক দুনিয়ার বেশির ভাগের বিরুদ্ধে ১৪০০ বছর ধরে যে অত্যাচার হয়েছে, তার জন্য ইসলামই দায়ী বলে আমরা মনে করি। ইসলামই আমাদের সকল সমস্যার মূল বলে আমরা বিশ্বাস করি এবং একে নিশ্চিতভাবে বর্জন করতে হবে।

ইসলাম সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা অপহৃত হয়নি। সন্ত্রাসবাদীরাই হলো প্রকৃত মুসলিম। মহম্মদের গর্বিত উক্তি— সন্ত্রাস বিজয়ী হবে (বুখারি : ৪.৫২.২২০)। সে হামলা, ভাঙচুর, লুঠপাট ও নিরীহ লোকেদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা, শিশু ধর্ষণ ও হত্যাকে ইসলাম মদত দেয়।

মানুষকে ভালবাসার জন্য, বিশ্বে শান্তির রক্ষার জন্য, আমাদের শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য আমরা ইসলামের নিন্দা করছি। আমরা মুসলিমদের কাছে এই ঘৃণার পথকে পরিত্যাগ করতে এবং বিশ্বের অবশিষ্ট মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে অনুরোধ করছি। আমরা এক সমাজ, আমাদের কোনো হিটলার, মার্কস, মহম্মদের মতো ঘৃণা উদ্রেকারী প্রবক্তা নেই যারা মিথ্যার ভিত্তিতে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। আমরা এই আবেদনে সাড়া দিতে আপনাকে অনুরোধ করছি এবং একে আরও প্রচার করতে বলছি। যতক্ষণ না ঘৃণা বর্জিত হচ্ছে ততক্ষণ শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ইসলাম শান্তির সব থেকে বড় বিপদ।

(Source : http://www.faithfredom.org/features/news/iranians-against-islam.)

সুতরাং মানবতাবাদী হিন্দুদর্শনই আবার বিশ্বপ্রিয় হয়ে উঠবে।

(লেখক রায়গঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক)

PIONEER®
নিখুঁত লেখার খাতা

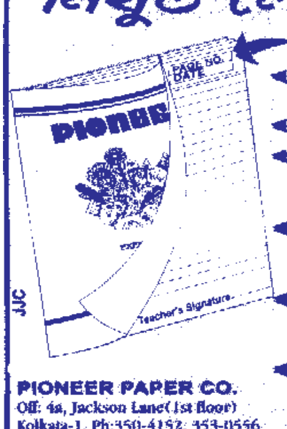

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane (1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

নেত্রদান মহাদান

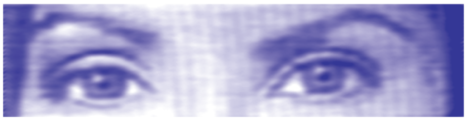

EYE BANK
23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451
অনুসন্ধান : 22181995, 22180387
সৌজন্যে : কলাভারতী

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

বাংলাদেশ সম্পূর্ণ হিন্দু উচ্ছেদের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে

বিমল প্রামাণিক

বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর ধর্মীয় নির্যাতন, অত্যাচার, খুন, ধর্ষণ, লুট, সম্পদে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ঘটনাগুলি অত্যন্ত সাধারণভাবে দেখা হয়ে থাকে। পাকিস্তানের আমলেও এমনটাই হোত। এটাকে ধর্মীয়-রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা দলমত নির্বিশেষে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ধুয়া তুলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু তথা হিন্দুদের উপর নির্যাতনের এইসব অস্ত্র প্রয়োগ করে থাকে; বিশেষভাবে পড়শি দেশ ভারতের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীকে ইস্যু করে তো বটেই।

দেশবিভাগের প্রাক্কালে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাভাগের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান বিভাজন আরো স্পষ্ট হয়ে পড়ে। তখন থেকেই পাকিস্তানে এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশে মুসলমান নেতৃত্ব হিন্দু জনগোষ্ঠী সম্পর্কে একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে আসছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা কখনই চায়নি বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতো হিন্দুরা মর্যাদা এবং অধিকারে বসবাস করুক। সৌহার্দ্য দূরের কথা, কখনও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও তারা হিন্দুদের প্রতি তাকায়নি। চিন্তা এবং চৈতন্যের জগতে পাকিস্তানি ভাবধারাই তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে, বলা যায় এটা মুসলিম লিগের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এখনও দেখছি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বাঙালি-জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকেই আঁকড়ে ধরে আছে। জিয়াউর রহমান যার উদ্গাতা; আগে ধর্মীয় পরিচয়, পরে জাতির পরিচয়, অর্থাৎ আগে মুসলমান, পরে বাঙালি। দেখা যাচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কট্টর ইসলামি ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত করতে পারেনি। এক্ষেত্রে, আওয়ামি লিগ নেতৃত্বের একাংশ বিএনপি-জামাতের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করে। সেই কারণেই দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন ও তাদের সম্পদ দখলের সময় বিএনপি-জামাতের সঙ্গে আওয়ামি লিগ নামধারীরাও রয়েছে।

এইসব কারণেই দেশ বিভাগোত্তরকালে পাকিস্তানে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে নিয়মিত হিন্দু জনসংখ্যার হ্রাস ঘটেছে। জনসংখ্যা হ্রাসের একটি প্রবণতা উল্লেখ করা হলো : *(সারণী দ্রষ্টব্য)*

একটা কঠিন সত্য এই যে, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে কোনো সরকারই কখনও সমাজে ও রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এমনকী সাম্প্রতিককালে হিন্দুদের উপর বহু জায়গায় হামলা হয়েছে, আওয়ামি লিগ পরিচালিত সরকারের শেষ পর্যায়ে এসে, কিন্তু এ সরকারের ভূমিকা হতাশাব্যঞ্জক।

একটা বিষয় উপলব্ধি করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না যে, অসংখ্য দুর্ভাগা, অসহায় হিন্দুদের ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে যে আত্মবলিদান, শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই তা অপসৃত হতে থাকে, এবং নিরাপত্তার অভাবে দলে দলে হিন্দুরা বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে থাকে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি এবিষয়ে ওয়াকিবহাল, যদিও এ সমস্যা নিয়ে তাদের কোনো উদ্বেগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে ধর্মভিন্ন বহুমুখীন বাঙালি সংস্কৃতি চর্চায় চরম ব্যর্থতার ফলেই ভারতের উপর বাংলাদেশী উদ্বাস্তুর চাপ তৈরি হয়েছে। সে দেশের বর্তমান শাসককুলও বাংলাদেশকে ক্রমান্বয়ে ধর্মীয় অনুশাসনের অর্থাৎ ইসলামিকরণের গভীর খাদের লক্ষ্যেই এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এটা আর কোনো গোপন বিষয় নয় যে, ইসলামি বিশ্বের নানা মৌলবাদী সংস্থা উগ্র ইসলামি ধ্যান-ধারণার এজেন্ডা নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করে চলেছে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য, ইসলামের উদারনৈতিক চরিত্রকে বাতিল করে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিকে নতুন উগ্র ইসলামি ভাবধারায় চালিত করা।

স্বাধীন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর, কোনো নতুন ঘটনা নয়। প্রতিটি নির্বাচনের সময়ই, যে দলই জিতুক বা হারুক, হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে। শুধু নির্বাচনের সময়ই নয়, গণতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক যে ধরনের সরকারই এতদিন শাসন করেছে, দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি আমলেই কম বেশি সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত হয়েছে। এটাই ভারত উপমহাদেশে মুসলমান শাসনের পরম্পরা নয় কি? যদিও যে কোনো সরকারের এটা ছিল বাধ্যতামূলক কাজ— (ক) সাম্প্রদায়িক ঘটনাগুলির সঠিক তদন্ত করা, (খ) তার বিচার ও শাস্তিবিধান করা, (গ) ঘটনাগুলির পিছনের কারণ চিহ্নিত করা ও তা নিরাময়ের ব্যবস্থা করা, (ঘ) সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু হায়! কোনো সরকারই আক্রমণকারী বা অপরাধকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনকালেও (৫ জানুয়ারি, ২০১৪) বাংলাদেশের বহু জেলায় সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেমন, সাতক্ষিরা, যশোর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, লালমণির হাট, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ,

ভোলা, ফেলি, মৌলভিবাজার প্রভৃতি। নির্বাচনের অনেক পূর্বেই সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ ও কিছু এনজিও সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নিকট আবেদন জানায় এই বলে যে, শুধু নির্বাচনের সময় নয়, আগে পরেও সংখ্যালঘুদের উপর হামলার আশঙ্কা রয়েছে, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক। সরকার ও নির্বাচন কমিশন আবেদনকারীদের এই মর্মে আশ্বস্ত করে যে, প্রতিটি উপজেলায় আধা-সামরিকবাহিনী ও

বা পরোক্ষ মদত ছিল না— একথা কি আমরা বলতে পারি? আমরা কি সরকারের কাছে বিচার পেতে আশা রাখতে পারি? যতদিন সংবিধানে একপেশে ভাব রক্ষিত হবে, ততদিন সংখ্যালঘুদের উপর এধরনের ঘটনা ঘটতেই থাকবে। এটা অচিন্তনীয় যে, সরকার বা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইন্ধন ছাড়া এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে' (আমাদের সময়, ১৮.১.১৪)। ৬৮টি নেতৃস্থানীয়

ও মন্দির ধ্বংস, মুক্তিপণ ও চাঁদা আদায়, নারীধর্ষণ, নির্যাতন, খুন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির খবর রয়েছে। এত হাজার হাজার ঘটনা ঘটলেও এখনও তার কোনো বিচার হয়নি (জনকণ্ঠ, ৫.২.২০১৪)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস প্রফেসর ও 'রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশ' সংগঠনের নেতা ডঃ আনিসুজ্জামান বলেছেন, 'আমরা পুলিশ বা সংবিধান দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে পারবো না, এটা আমাদের মনস্তত্ত্বের

সারণী

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা ১৯৫১-২০১১

	১৯৫১ (%)	১৯৬১ (%)	১৯৭৪ (%)	১৯৮১ (%)	১৯৯১ (%)	২০০১ (%)	২০১১ (%)
মুসলমান	৭৬.৯	৮০.৪	৮৫.৪	৮৬.৭	৮৮.৩	৮৯.৭	৯০.৪
হিন্দু	২২.০	১৮.৪	১৩.৫	১২.১	১০.৫	৯.২	৮.৫
বৌদ্ধ	০.৭	০.৭	০.৬	০.৬	০.৬	০.৭	০.৬
খৃস্টান	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩
অন্যান্য	০.১	০.১	০.২	০.৩	০.৩	০.২	০.১

উৎস : বাংলদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, প্রথম আলো, ২২.০৯.২০১২ প্রকাশিত

পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে এবং নির্বাচনকালীন সামরিকবাহিনীও মোতায়েন করা হবে। সংখ্যালঘুদের যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু দেখা গেল এত নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু গ্রামগুলিতে হামলা মোকাবিলা করা গেল না। সেখানে অবাধে চললো লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণসহ নানা ধরনের অত্যাচার। এ বিষয়ে কোনো রাজনীতির ভেদাভেদ চোখে পড়ল না। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরি ১৭ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'আমরা যৌথবাহিনী ও পুলিশবাহিনীর কোনো ভূমিকাই দেখতে পেলাম না যখন সংখ্যালঘুদের উপর উপর্যুপরি হামলা হতে থাকলো। বিশেষ করে, যশোরের অভয়নগর, মণিরামপুরের ঘটনা সভ্যজগতের মাথা হেট করে দিয়েছে। এর পিছনে সরকার তথা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ

মানবাধিকার ও মহিলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস বন্ধ না হওয়ার জন্য রাষ্ট্র এবং বিচার বিভাগের নিদারুণ ব্যর্থতাই দায়ী। ২০০১ সালের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনকে কেন্দ্র করে ২৭টি মামলা রুজু করা হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটিরও বিচার হয়নি।' ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে ও পরের ১৫০০ দিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন' তিন খণ্ডে প্রকাশ করেছেন 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র নেতা বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবির। ওই তিনখণ্ডের শ্বেতপত্রে ৪১৭৯টি রিপোর্ট বেরিয়েছে। প্রত্যেকটি রিপোর্টে এক বা একাধিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এতে প্রায় দশ হাজারের মতো ঘটনা রয়েছে। এসব রিপোর্টে হিন্দুদের উপর সহিংসতা, তাদের বাড়িঘর লুঠ, জমি-বাড়ি-সম্পদ দখল, মূর্তি

ব্যাপার এবং সেটা গুরুত্বপূর্ণ' (আমাদের সময়, ২২.১.১৪)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনযন্ত্র কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সেদেশে শান্তিপূর্ণ বসবাসের পক্ষপাতী? এই প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, বাংলাদেশের আমলে মাত্র ৩৬ বছরেরই অর্থাৎ ১৯৭৪-এর প্রথম জনগণনা থেকে ২০১১ সনের শেষ জনগণনা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে হিন্দু জনসংখ্যা ১৩.৫ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৮.৫ শতাংশে— এটা কেমন করে হলো? এই তথ্য থেকে এটা পরিস্কার যে, সেদেশের সরকার ও বুদ্ধিজীবীদের অভয়বাণী এবং আশ্বাসবাণী সবই ছিল কথার কথা। এর পিছনে কোনো আন্তরিকতা ছিল না, যা ছিল, তা হচ্ছে অভিসন্ধি। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেদেশের হিন্দু নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছে, 'ভোটার তালিকা থেকে আমাদের নাম বাতিল করুন অথবা আলাদা

নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন।' এতে অন্তত নির্বাচনের অজুহাতে হিন্দু সম্প্রদায় আক্রান্ত হবে না।'

দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দুদের উপর আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে, তাদের ভূসম্পত্তি ও সম্পদ দখল; আর এটা করা হচ্ছে 'আওয়ামি লিগের ভোট দেওয়ার' অজুহাত খাড়া করে। উগ্র ইসলামি আদর্শ কায়েমের নামে মন্দির, প্যাগোডা, চার্চ প্রভৃতি ধর্মস্থানের উপর আক্রমণ চালানোকে সমাজের একটা বড় অংশের মানুষের সমর্থন পাচ্ছে। আর তা হচ্ছে দলমত নির্বিশেষে।

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন বা উগ্র ইসলামি গোষ্ঠীগুলির কোনো নৈতিক চরিত্র নাই। যখন ২০১৩ সালে ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদ চত্বরে তাদের ক্যাডার ও সমর্থকরা ইসলামের ধর্মগ্রন্থ বিপুল সংখ্যক কোরানসহ অন্যান্য পুস্তক দোকানে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিল, তখন ওইসকল সংগঠনের সমর্থক মওলানা ও ধর্মপ্রচারকগণ চুপ থাকলেন। এরা নিজেদের ইসলামের রক্ষাকারী বলে থাকেন এবং অমুসলমানদের উপর অত্যাচার ও আক্রমণের ইন্ধন দিয়ে থাকেন। মাদ্রাসা তথা ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে অমুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রচার করেন। বর্তমান বাংলাদেশের সমাজে এদের বাড়বাড়ন্তই বেশি। ফলে বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা থাকা অসম্ভব। অবশ্য দুনিয়ার অন্যান্য ইসলামি দেশেও অমুসলমানদের একই অবস্থা। যদি আওয়ামি লিগ পরিচালিত সরকার দেশে অমুসলিম তথা হিন্দু জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা দিতে আগ্রহী হয়, তবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ জরুরিভাবে নেওয়া উচিত। (ক) ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন, (খ) বাংলাদেশে একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রণয়ন ও প্রাইভেট মাদ্রাসার উপর নিয়ন্ত্রণ, (গ) ধর্মভিত্তিক রাজনীতির নিষিদ্ধকরণ, (ঘ) সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন।

'হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ' নামের একটি এনজিও'র আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ হাইকোর্ট ২০০৯ সালের ৬ মে এক নির্দেশে বাংলাদেশ সরকারকে বলে, ২০০১ সালে সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রিক সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ প্রভৃতি অত্যাচারের ঘটনাগুলি তদন্ত করে একটি রিপোর্ট জমা দাও। সরকার একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজের নেতৃত্বে তিন সদস্যের কমিশন গঠন করে। ২০১১ সালের ২৪ এপ্রিল কমিশন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রিপোর্টটি জমা করে। রিপোর্টে মোট ৫৫৭১টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে ৩৫৫টি খুনের অভিযোগ, ৩২৭০টি ধর্ষণ ও আগুন লাগানোর অভিযোগসহ অন্যান্য মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিসেস সাহারা খাতুন রিপোর্টটি গ্রহণ করে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা হবে'। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে এ রিপোর্ট চাপা পড়ে থেকেছে। জনগণ গত আওয়ামি লিগ সরকারের প্রতিশ্রুতি ও বেগম জিয়ার বিএনপি সরকার ও তার ক্যাডারদের দুষ্কর্ম আজ ভুলতে বসেছে।

এই হচ্ছে বাংলাদেশ! কেমন করে একজন সংখ্যালঘু মানুষ সরকারের কাছে বিচারের আশা করতে পারে? দেশের সংখ্যালঘুরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে, দেশ স্বাধীন হলে তারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মতোই সমান অধিকার ও সুবিধা ভোগ করতে পারবে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তারা দেখতে পেলো পাকিস্তানের মতোই তাদের উপর বৈষম্য ও অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর এই অত্যাচার নানা ধরনের। সাংবিধানিকভাবে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর; অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যমূলক আইন ও ব্যাবহারিক ব্যবস্থায় তারা প্রায় পঙ্গু; রাজনৈতিকভাবে তারা মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এবং জাতীয়ভাবে তারা সাম্প্রদায়িক হামলার শিকারে পরিণত। আর অনেক সময়ই প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন মোকাবিলায় সরকার নিজেই এ সকল সাম্প্রদায়িক হামলায় মদত দিয়ে থাকে বা সংগঠিত করে থাকে। সরকারের এই বৈষম্যমূলক নীতি, কৌশল ও আচরণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জমি দখল, লুটপাট, আগুন দিয়ে পোড়ানো, ধর্ষণ, খুন, মন্দির ও মূর্তিভাঙা, সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ। সরাসরি সহযোগিতা এর পিছনে দেখা না গেলেও রয়েছে সরকারি বা আধা সরকারি এজেন্সির মদত। ফলে বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ এখনও অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রথম থেকেই হিন্দু বিদ্বেষ ও ভারত বিরোধী মনোভাব দেশটির সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ভারতের বিরুদ্ধে তথাকথিত দাদাগিরিসুলভ আচরণের অভিযোগ তুলে স্থানীয় দুর্বল হিন্দু সম্প্রদায়কে ভারতের প্রতিভূ হিসাবে খাড়া করে প্রতিশোধ গ্রহণের পাকিস্তানি মানসিকতাই বাংলাদেশি মুসলমানেরা আকড়ে ধরেছে। মুক্তিযুদ্ধ তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনোই পরিবর্তন আনতে পারেনি। 'হিন্দুরা ভারতের বন্ধু— তাদের বিশ্বাস করা যায় না' ওই ধারণা বাংলাদেশের সমাজের গভীরে প্রবেশ করেছে। মৌলবাদীরা তথা একশ্রেণীর মওলানারা এটা প্রচার করে থাকে যে, 'হিন্দুরা পুতুল পূজারি, তারা সরাসরি নরকে যাবে; খৃস্টান ও ইহুদিগণ মুসলমানদের মতো এক নবিতে আস্থা রাখে, তাদের বিশ্বাস করা গেলেও, হিন্দুদের কখনই নয়।' স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে এই প্রচার পাকিস্তান আমলের চেয়েও সমাজের গভীরে নাড়া দিয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক প্রসারই এ ধরনের ধারণা বিস্তারে সহায়ক হয়েছে। এই ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে, 'ভারতবন্ধু' দল হিসেবে আওয়ামি লিগের পরিচিতি হওয়ার ফলে অধিকাংশ সময়ই তারা হিন্দুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করছে না। তাহলে দুর্বল হিন্দু সম্প্রদায়ের বাংলাদেশে নিরাপত্তা কোথায়? অবশিষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিই বা কারা? দেশ বিভাগের বলি অসহায় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি কি ভারতের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই?

(লেখক : ডিরেক্টর, সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইন্দোবাংলাদেশ রিলেসন্স্)

ভোট সর্বস্ব রাজনৈতিক দলের কাছে উদ্বাস্তুদের ন্যায়বিচার পাওয়া দূরঅস্ত

অসিত বরণ ঠাকুর

বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুর যন্ত্রণায় ধর্মমত নির্বিশেষে সমগ্র মানবহৃদয় একবার অন্তত আলোড়িত হোক'— এই আর্তি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এক মানবিক দাবি। এটা সভ্যতারও দাবি। জন্মতে কারও হাত নেই। কোনো বিশেষ ধর্মের, জাতের বা দেশের তকমা জন্মগতভাবেই গায়ে লেগে যায়। এতে তার কিছু করার থাকে না। বড় হয়ে বা স্বাবলম্বী হয়ে সে নিজের বোধবুদ্ধিমত চলাফেরা, মতবাদ তৈরি বা গ্রহণবর্জন করতে পারে। তা সত্ত্বেও ধর্মব্যবস্থা ও তার সংস্কৃতির অনুশীলনের নিরন্তর প্রয়াস প্রয়োজন। উনবিংশ শতকে বাংলায় নবজাগরণের আন্দোলন শুরু হলেও এপার বাংলায় আজ এখন স্তিমিত। বাংলাভাষার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে যে মুক্তি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল আজও তারা সেই আন্দোলনকে নবজাগরণে পরিণত করার চেষ্টা করে ধর্মীয় মৌলবাদকে রোখার চেষ্টা করছে। আমরা এপার বাংলায় নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকা শ্রেয় মনে করছি। বরং পরোক্ষে ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। এতে আমাদের কোনো লজ্জাও হচ্ছে না। এটা বড় বেদনার। নৈরাশ্যজনকও বটে।

বাংলাদেশের ধর্মীয়সংখ্যালঘু নির্যাতনে ধর্মমত নির্বিশেষে এপার বাংলার সবাইকে বিশেষ করে বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানদের এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন যাতে মানবতাধর্মী মতবাদ প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশের এই দুর্দিনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও তার শাখা সংগঠন UNHCR অর্থাৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিফিউজি হাই কমিশনারের হস্তক্ষেপ করা দরকার। এতে হিন্দু সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তা পাবে ও আশ্বস্ত বোধ করবে।

আশার কথা, বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা নবজাগরণের লাগাতার আন্দোলনে ও হাসিনা সরকারের দৃঢ় ধর্মীয় মৌলবাদী বিরোধী পদক্ষেপে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও জীবন হানির বিনিময়ে ক্ষমতা ধরে রাখায় হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ব্যাপকতার রাশ টানা সম্ভব হয়েছে। সেজন্য ২০০১ সালে বিএনপি-র ক্ষমতা দখলের সময়ে হিন্দু নির্যাতন ও অত্যাচারিত হয়ে এদেশে আসার সংখ্যার তুলনায় এবারের সংখ্যা যথেষ্ট কম। আইন করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে হবে বাংলাদেশে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এপার বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষ সুশীল সমাজ বা মানবতাবাদী আন্দোলনে নিয়োজিতদের ওপার বাংলার সংখ্যালঘু নির্যাতনে ও তাদের এদেশে শরণার্থী হয়ে আসার সংবাদে বিচলিত হতে দেখা যাচ্ছে না। এটা কি তাদের স্বার্থপরতা-তাড়িত নির্বুদ্ধিতা? নাকি ভোটের লোভে এদেশের নিরাপদে থাকা মুসলমানদের চোখে মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণ দেওয়ার প্রতিযোগিতা? ওপার বাংলার সংখ্যালঘুরা অধিকাংশই তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু হওয়ায় পুরাতন ঘৃণাজনিত অবহেলাও একটা অন্যতম কারণ হিসাবে অনেকে মনে করেন। উদ্বাস্তুদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের শরিক হয়ে আমাকে অনেক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, প্রগতিবাদী বা মানবতাবাদী, পরিবর্তনপন্থী, অতি পরিচিতের (এখন অনেকে এমপি, নেতা, মন্ত্রী) বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয়েছে।

বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে বর্ণবাদ ও জাতপাতজনিত সহস্র বৎসরের সনাতনী মানব বিভাজনের উঁচু-নিচুবাদের অসাম্য ও বৈষম্যের রোগ নির্মূল

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা (পিন কোড সহ) এবং ফোন নম্বর থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না

— সঃ স্বঃ

না হওয়া পর্যন্ত হিন্দুত্ব বা হিন্দুধর্মের উদারতার বিশ্বাসযোগ্যতা বা তার সুফল সর্বজনে বিতরিত হওয়া সম্ভব নয়। তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানসিকতার পরিবর্তন না হওয়ায় হিন্দু একতা বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের উগ্রতাও প্রশমিত হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং বর্তমান শাসকরা ধর্মকে ও বর্ণকে যথেচ্ছভাবে অবব্যহার করে সংকীর্ণ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধিতে কাজে লাগাচ্ছে। এখানে ক্ষমতালোভী শহুরে ভোগবাদী, ব্যক্তিস্বার্থবাহী বাবু সংস্কৃতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলছে। কলকাতায় রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদির কেন্দ্রিকতায় গ্রামবাংলার মানুষ ক্ষমতাহীন হয়ে কলকাতার বাবুদের হুকুমের দাসে পরিণত। পঞ্চায়েতও কলকাতার হুকুমে চলে। সব রক্ত মাথায় উঠলে যা হয় তাই হয়েছে। এটা সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। বাবু সংস্কৃতির সৃষ্ট শহুরে উন্নাসিক বাঙালিরা অন্য প্রদেশের মানুষদের খারাপ চোখে দেখে। তাদের সমমর্যাদা দেয় না। গ্রাম বাংলার মানুষদেরও ওই চোখে দেখে। বিহার থেকে আগত ট্যাক্সিচালকের নাবালিকা মেয়েকে দুই-দুবার গণধর্ষণ ও নিরাপত্তাহীনতায় এবং তার সঙ্গে প্রশাসন ও পুলিশের অন্যায় ও অবিচারের কারণে তাকে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। এটা আমাদের পরাজয় ও লজ্জার কারণ হয়ে থাকবে চিরদিন। বাঙালির সংস্কৃতির গর্ব আজ ধূলায় লুণ্ঠিত হলো। অন্যেরা আমাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আঙুল তুলবে।

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ভারত সরকার ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের পরে ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে একতরফা ও অমানবিকভাবে তাদের উদ্বাস্তু স্বীকৃতির অধিকার কেড়ে নিয়ে নাগরিকত্ব দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তার পরিণতিতে সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দু'কোটির বেশি পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু বে-নাগরিক হয়ে পথে ঘাটে মানবেতর জীবনে অভ্যস্ত হতে হচ্ছে। বাংলাদেশে লাগাতার নির্যাতনে ভারতে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। বহু আবেদন-নিবেদন বা আন্দোলনে এই সমস্যার কোনো সমাধান আজও হলো না।

পশ্চিমবাংলা, ওড়িশা, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অসম ইত্যাদি রাজ্যে উদ্বাস্তুদের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করার ভাষা নেই। সেখানে পুলিশ, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের অবহেলা, বঞ্চনা, হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণ মাত্রাতিরিক্ত। তাদের না আছে ভোটাধিকার, না আছে জীবন- জীবিকার ব্যবস্থা। অসমের উদ্বাস্তুরা তো বেনাগরিক হয়ে 'D' Doubtful ভোটারে চিহ্নিত হয়ে ট্রাইব্যুনালের বিচারের সম্মুখীন। বহিষ্কারের আশঙ্কায় তারা দিন গুনছে।

২০১০ সালের ২৮ ডিসেম্বরে 'সারাভারত মতুয়া মহাসঙ্ঘ'-এর নেতৃত্বে কলকাতায় আয়োজিত উদ্বাস্তুদের মহাসম্মেলনে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব ও পুনর্বাসন দেওয়ার সর্বদলীয় প্রতিশ্রুতি আজও পূরণ করা হলো না। এ ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক দলই উচ্চবাচ্য করছে না। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস বা প্রধান বিরোধী বিজেপি প্রতিশ্রুতির শরিক হয়েও নিশ্চুপ। তৃণমূল কংগ্রেস তো একথা বলতেই ভয় পায় পাছে তাঁদের পোষ্য হিসাবে দেখা সংখ্যালঘু ভোটে টান পড়ে। তারা বুঝতে অপারগ যে এটা কোনো সম্প্রদায়ের কথা নয়। ভারতভাগের বলি হিসাবে উদ্বাস্তুদের ঐতিহাসিক ও জন্মগত অধিকারের কথা বাদ দিলেও কেবলমাত্র মানবিকতার কারণেই বে-নাগরিক উদ্বাস্তুরা রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদ প্রদত্ত সার্বিক পুনর্বাসনের অধিকারী। ২০০৩ সালের নাগরিক আইন সংশোধনে বে-নাগরিকরা এখন অবৈধ প্রবেশকারী হওয়ায় উদ্বাস্তু সমস্যা আরও বেড়েছে। ওই আইন পুনরায় সংশোধন দরকার, উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বে দেওয়ার জন্য যেটা পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য গুজরাট ও রাজস্থানে হয়েছে ২০০৪ সালের নতুন বিধিতে।

পশ্চিমবাংলায় দণ্ডকারণ্য ফেরত উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপিতে ১৯৭৮-৭৯ সালে দমন-পীড়ন, গণহত্যা ও উৎখাতের শিকার হয়েছে বাম সরকারের আমলে। প্রায় ১৭ হাজার উদ্বাস্তুর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। উদ্বাস্তুরা এককালে বাম সরকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করলেও তারা এর প্রতিশোধ নিয়েছে বিগত নির্বাচনে হারিয়ে। তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচন পর্বে মরিচঝাঁপি গণহত্যার বিচার ও ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে।

ক্ষমতাধিষ্ঠ হয়েই ১৭ জুন ২০১১-র প্রথম বিধানসভার বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মরিচঝাঁপি গণহত্যার তদন্ত কমিশন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে অনেক তদন্ত কমিশন গঠন হলেও মরিচঝাঁপির গণহত্যার বিচারের জন্য কিছু করা হয়নি। এমনকী মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত হওয়া ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের নির্বাচন পর্বের প্রতিশ্রুতিতে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেও কোনো অজ্ঞাত কারণে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মরিচঝাঁপির ক্ষতিগ্রস্তদের সম্বর্ধনা দেওয়া যে নাটক ছিল তা আজ জলের মতন পরিস্কার। তারা নিজেরা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা খোয়ালেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৮৪ সালের দিল্লীর শিখ দাঙ্গার সিবিআই তদন্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলে 'মরিচঝাঁপি গণহত্যা'-র সিবিআই তদন্ত হবে না কেন? ক্ষতিগ্রস্তরা অসহায় নিম্নবর্গীয় বলে?

লোকসভা নির্বাচন সমাগত। ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় সবাই মাঠে ময়দানে নামতে শুরু করেছে। বিভিন্ন রকমের প্রতিশ্রুতির বন্যা বইবে খুব তাড়াতাড়ি। দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলন করে 'আম আদমি পার্টি' নামের এক নতুন দল দিল্লীতে কংগ্রেসের সমর্থনে ক্ষমতা দখল করেছিল। এই রাজনৈতিক পরিবেশে আশাহত উদ্বাস্তুরাও আগামী নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি নেবে এটা বলাই বাহুল্য।

(লেখক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন যুগ্ম স্বরাষ্ট্র সচিব)

চিঠিপত্র

ভারতে স্বদেশী ভাষার ভবিষ্যৎ

ঐতিহাসিক হেনরি বিভারিজ তাঁর A Comprehensive History of India, Vol. 1, p. 18-তে লিখেছেন, 'পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি অসভ্য অবস্থা ('barbarism') থেকে উপরে ওঠার বহুকাল পূর্বেই ভারতে ছিল একটি সম্পূর্ণ ব্যাকরণ-শুদ্ধ ভাষা, যে ভাষায় লেখা হয়েছে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় মূল্যবান গ্রন্থ। সেইসব গ্রন্থের অনেকগুলিই বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিষয়ে, ইতিহাস সংকলনের মতো সহজ কাজ থেকে অনেক অনেক বেশি উন্নতমানের কাজ যা করা সম্ভব হয়েছিল তাঁদের উচ্চস্তরের প্রতিভারই জন্য' ('Long before the nations of Western Europe had began to emerge from barbarism, it (India) was in possession of a language remarkable for the completeness of is its grammatical forms, for Copiousnessand for the number and variety of works which had been written in it.')। এই ভাষাই সংস্কৃত ভাষা যা ভারতবাসী তথা হিন্দুদের আদি ভাষা। এই ভাষায় ঋষিরা সৃষ্টি করেছিলেন পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ।

এই ভাষায় বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে ভারত পেয়েছিল পৃথিবীতে গুরুর আসন। তাঁরা সৃষ্টি করেছেন বেদ, উপনিষদ, মহাকাব্য, অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বঞ্চিত যখন হলো তখন থেকে সেই অমূল্য ভাষা যা সৃষ্টি করতে লেগেছিল বহুকাল ধরে সাধনা, তা ধীরে ধীরে প্রাণশক্তি হারাতে থাকল। সুতরাং যে জাতি রাষ্ট্রক্ষমতা হারায় তারা তাদের ভাষাও হারায়। এখন আবার নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে। সংস্কৃত তো গেছে, মনে হয় মাতৃভাষা বাংলাও ধীরে ধীরে আগামীদিনে অচেনা-অজানা হতে থাকবে। গত বছর একটা মেলায় বাংলা বই-এর স্টলে বসেছিলাম সল্টলেকে। অনেক ছেলে-মেয়েকে বাংলা বই দিলাম। তারা অনেকে নিল না। বলল, 'আমরা বাংলা পড়তে পারি না।' তাদের সংখ্যাটা খুব কম নয়।

সুপরিকল্পিতভাবে এসব হচ্ছে কিনা জানি না। তবে ইংরেজি স্কুলের সংখ্যা, মিশনারি স্কুলের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। আমরা অনুকরণ করছি ও অনুসরণ করছি বিদেশী ভাষা। ফলে মাতৃভাষা মার খাচ্ছে। হয়তো সংস্কৃতের মতো বাংলা ভাষারও অবস্থা হবে। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, অনুকরণ করে কোনো জাতি বাঁচতে পারে না। ফরাসীরা, চীনারা, আরবরা, ইহুদীরা কি ইংরেজি শেখে নিজেদের মাতৃভাষাকে কম গুরুত্ব দিয়ে?

তার উপর মরার উপর খাঁড়ার ঘা। বাংলা স্কুলে পাশ ফেলের ডিটেনশন নেই। ফলে পড়াশুনার জন্য পরিশ্রমের চাপ নেই। শেখার আগ্রহ বাড়বে না কমবে? মনে হয় পরীক্ষার চাপ না থাকায় পড়ার ও শেখারও চাপ থাকবে না। ভবিষ্যৎ জীবনে ওইসব স্কুলে পড়ে ছেলে-মেয়েরা কি উচ্চ স্থানে ওঠার আশা করতে পারবে?

—**কৃষ্ণকান্ত সরকার,**
দমদম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মাইকেল মধুসূদন সমাচার

ডঃ স্বরূপ ঘোষ 'উত্তর সম্পাদকীয়' নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ১৩.১.১৪) প্রসঙ্গত বলেছেন— ''মধুসূদন দত্ত ধর্ম পরিবর্তন করে মাইকেল হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে, ঠাকুর একটি কথাও বলেননি তাঁর সঙ্গে।'' ঘটনাটি ঠিক তা ছিল না; তাই একটু বিশদভাবে বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

রানি রাসমণির তরফে একটি মোকদ্দমার বিষয়ে আলোচনার জন্য মাইকেল মধুসূদনকে একবার দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কাজের শেষে একথা সেকথায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে আছেন জেনে তাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শ্রীরামকৃষ্ণকে সংবাদ দেওয়া হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রীকে পাঠান এবং পরে তিনি নিজেও যান। শাস্ত্রীজী স্বধর্মত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করলে মাইকেল মধুসূদন পেট দেখিয়ে বলেছিলেন, 'পেটের জন্য ছাড়তে হয়েছে।' ওকথা শুনে নারায়ণ শাস্ত্রী বলেছিলেন— 'যে পেটের জন্য ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কি কইব।' তখন মাইকেল শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন, 'আপনি কিছু বলুন।' শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু বলতে পারেননি। তাঁর কথায় ''আমি বললাম, কে জানে কেন আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। আমার মুখ কে যেন চেপে ধরছে।''

('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' ৪র্থ ভাগ, পঞ্চদশ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

উক্ত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ হৃদয় (শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগিনেয়) এবং আরও কয়েকজনের কাছে শুনেছেন, — ''কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ওই ভাব চলিয়া গিয়াছিল এবং তিনি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ বিশিষ্ট সাধকের কয়েকটি পদাবলী মধুর স্বরে গাহিয়া মধুসূদনের মন মোহিত করিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যপদেশে তাঁহাকে, ভগবদ্ভক্তিই যে সংসারে একমাত্র সার পদার্থ, তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন।''

—('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ'; দ্বিতীয় ভাগ, 'গুরুভাব-উত্তরার্ধ; দ্বিতীয় অধ্যায়; 'ঠাকুর ও মাইকেল সংবাদ')।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন ও বাঙালি সেকুলার বুদ্ধিজীবী

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের কিছু কথা উল্লেখ করছি। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পর ১৯৪৯ সালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বগুড়া জেলার সান্তাহারে ব্যাপকভাবে হিন্দু নিধন হয়েছিল। তারপর ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে হিন্দুরা মৌলবাদীদের আক্রমণে ধন, মান-সম্ভ্রম হারিয়ে কেউ বা পশ্চিমবাংলায় এসেছিলেন কেউ বা ওদেশে থেকে গিয়ে চিরশান্তি লাভ করেছেন। ঐতিহাসিক ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ তার লেখা ‘‘রক্তমাখা ইতিহাসের পাতা থেকে’’ প্রতিবেদনে পূর্ববঙ্গের ওই সমস্ত ঘটনার কথা ২০০৭ সালে স্বস্তিকা কাগজে নিপুণভাবে লিখেছেন। সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা পড়ে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না।

১৯৬২ সালের মার্চ মাসে রাজশাহী রেলস্টেশনের কয়েক মাইল দূরে এক বুধবারের রাত্রিতে ডাউন আসনুরা-পার্বতীপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে হিন্দু নিধন করা হয়। এর একদিন পর রাজশাহী শহরের ৭-৮ মাইল দূরে গোদাগাড়ি থানার অন্তর্গত দারুসা, কর্ণহার, ধরমপুর, বিলধরমপুর প্রভৃতি গ্রামের হিন্দুদের ধনসম্পদ লুঠ ও গৃহদাহ করা হয়। এর দুদিন পর দারুসা হাটে জমায়েত হওয়া হিন্দুদেরকে রাত্রিতে পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার ১৫/১৬ দিন পরে আমি নিজে ওই এলাকায় আমার আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে সেই বীভৎস কাণ্ডের চিহ্ন দেখেছি। সে সময় পশ্চিমবাংলা থেকে কারও কোনও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই।

শুধু পাকিস্তানি শাসকদের আমলেই নয় স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার পরও ওদেশের হিন্দুসমাজ মুসলিম সন্ত্রাসীদের হাতে ধারাবাহিক ভাবে নির্যাতিত হয়ে চলেছে। সেই সমস্ত হিন্দু নির্যাতনের কথা বিশদভাবে আমরা জানতে পারি বাংলাদেশের প্রতিবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের ‘লজ্জা’ বই পড়ে।

তসলিমা নাসরিন সেদেশের মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কলম ধরার জন্য মৌলবাদীরা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করলে তিনি পশ্চিমবাংলায় এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু তসলিমার কলকাতায় আসার খবরে কলকাতার মুসলিম মৌলবাদীরা প্রকাশ্য দিবালোকে লাঠি, তরোয়াল ইত্যাদি নিয়ে বিরোধিতা করে। আশ্চর্যের বিষয়, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার মিছিলকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তসলিমাকেই বাংলাছাড়া করেছিল এবং তার পরেই ভারত বিভাজনকারী কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার তসলিম নাসরিনকে দেশছাড়া করেছে। এরজন্য এই বাংলার সুশীল সমাজ থেকে কোনো প্রতিবাদ ওঠেনি।

এবারের বাংলাদেশের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে থেকেই সেখানকার সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জামায়াত ইসলাম ও বিএনপি সহ ১৮ দলের জোট বাংলাদেশে বন্‌ধ, অবরোধ ইত্যাদি করে জনজীবন স্তব্ধ করার পাশাপাশি হিন্দুদের ওপর নির্যাতন শুরু করে। ৫ জানুয়ারি ভোট হওয়ার পর থেকে যেভাবে হিন্দু নির্যাতন শুরু হয়েছে তা বিশদভাবে জানা গেল ১৩ জানুয়ারির বর্তমান কাগজে ঢাকা থেকে লেখা শাহরিয়ার কবিরের লেখা— ‘মনে রাখতে হবে জামায়াতের গডফাদার আই এস আই’ শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে।

২০০১ সালে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সেদেশে বিশাল সংখ্যক পাকিস্তানি গোয়েন্দার উপস্থিতি এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান হয়েছিল। এর প্রমাণ, সে সময় আমেরিকার ‘নিউইয়র্ক পোস্ট’ লিখেছিল— ‘‘বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ মুসলিম। সেখানে চেষ্টা চলছে শরিয়ত ভিত্তিক সংবিধান-সহ ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ’’ গড়ে তোলার। লক্ষ্য একটাই বাংলাদেশের ইসলামিকরণ ঘটানো।

আমেরিকার টাইম পত্রিকা লিখেছিল— ‘‘এক বিশাল আলকায়েদা দল ঢাকায় এসেছে। আমেরিকার সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধে বাংলাদেশ এক নতুন বিপজ্জনক ফ্রন্ট হয়ে উঠতে পারে।’’

এছাড়া সে সময় বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিতে লেখা হয়েছিল--- ‘‘সেখানকার হিন্দুরাই জঙ্গিদের প্রথম টার্গেট।’’ বিভিন্ন সংবাদপত্র হিন্দুদের খুন, জখম, ধর্ষণ ও ভিটেছাড়া করার অজস্র খবর ছাপিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় ছিল বিএনপি সরকারের শরিক দলগুলি রাস্তায় মিছিল করে স্লোগান দিয়েছিল— ‘‘একটা দুটো হিন্দু ধরো, সকাল বিকাল নাস্তা করো।’’ তবুও খালেদা সরকার জঙ্গিদের কিছু বলেনি। আরও আশ্চর্যের বিষয় ছিল সেই সময়ও একমাত্র বিজেপি ছাড়া এ বঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা বা রাজনৈতিক শক্তিগুলি পূর্ববৎ নিশ্চুপ ছিল। এখনও তারা কোথাও হিন্দু নির্যাতন হলে চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করে।

শেখ হাসিনা সরকার বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকে তিনি কড়া হাতে জামায়াত ইসলামী ও মৌলবাদীদের দাপটে কমানোর চেষ্টা করছেন। ভোটের পর থেকে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার অভিযোগে কয়েকজন সন্দেহভাজন দুষ্কৃতীকে আটক করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে আধা সামরিক সীমান্ত সুরক্ষা বাংলাদেশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। আশা করা যায়, তিনি সেখানকার সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে পারবেন। দেশ ভাগের অব্যবহিত পরে সীমান্ত প্রদেশের পাঠান নেতা খান আব্দুল গফফর খান সজল চক্ষে গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন— ‘‘কেন আপনি আমাদেরকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দিলেন?’’ সেই সূত্রে বলা যায় পূর্বপাকিস্তানেও সংখ্যালঘুদের গান্ধীজী অ্যান্ড কোম্পানি নেকড়ের মুখে ছেড়ে দিয়েছেন।

পূর্বসূরি বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক শক্তিগুলি সেদিন যে পাপ করেছিল তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বর্তমানের শিক্ষিত সমাজ ও প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলির অন্তত একবার বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের প্রতিবাদে বিশ্বরাজনীতির দরবারে প্রতিবাদ জানানো উচিত।

স্বর্গে অদ্ভুত দাতা

উমা রানি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীনকালে একজন জুয়াড়ি কোনো এক জায়গায় বাস করতো। তার কোনো দেব-দ্বিজে ভক্তি তো ছিলই না উপরন্তু যত কুকর্ম আছে তাতে লিপ্ত ছিল। ব্যভিচারের অন্ত ছিল না। চুরি-জোচ্চুরি, বাটপারি, মদ, নারীআসক্তি প্রভৃতিতে সে সিদ্ধহস্ত ছিল। একদিন সে জুয়া খেলায় জোচ্চুরি করে বহু অর্থ জিতে নিল। এরপর ভাবল এই টাকা নিয়ে কিছুদিন আমি বেশ আনন্দেই থাকতে পারবো। তখন সে সেই টাকা থেকে বেশ কিছু ফুল, ফুলেরমালা, গন্ধদ্রব্য ও নানান জিনিসপত্র কিনে এক স্বৈরিণীর ঘরে যাবার জন্য তৈরি হলো। মনের ফূর্তিতে সে ওইসব জিনিস নিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে তার বাড়ির উদ্দেশে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ রাস্তায় পড়ে থাকা এক ইটে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। তার আঘাতটা জোরে লাগায় সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়লো। বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন হঠাৎই তার মন বৈরাগ্যে ভরে গেল। সে ভাবতে লাগলো এই জিনিসগুলি নিয়ে স্বৈরিণীর বাড়ি যাচ্ছিলাম কিন্তু কি যে হলো কে জানে, এগুলি সব পড়ে গেল, আর যাবার ইচ্ছাও অনুভব করছি না। তাহলে এগুলি এখন কি করবো, ভাবতে ভাবতে সে দেখলো অদূরে একটা শিবলিঙ্গ বিরাজ করছে। তখন সে ওই গন্ধদ্রব্য, ফুল, ফুলেরমালা ইত্যাদি তুলে নিয়ে এসে বেশ ভক্তিভরে শিবের নামে উৎসর্গ করলো ও মনেও বেশ তৃপ্তি অনুভব করলো। সারা জীবনের মধ্যে সে এই একবারই পুণ্য কাজ করেছিল। এটাই ছিল তার জীবনে প্রথম ও শেষ পুণ্য কাজ।

যাই হোক, এর পর যথারীতি দিন কাটতে লাগলো। একদিন তার মৃত্যু ঘটলো। তখন স্বর্গ থেকে যমরাজ তাঁর দূতকে ওই জুয়াড়ির আত্মাকে নিয়ে আসতে পাঠালেন। যমদূত জুয়াড়িকে নিয়ে স্বর্গে পৌঁছলে যমরাজ তাকে বললেন তুমি অত্যন্ত পাপী তাই তোমাকে বড় বড় নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এই কথা শুনে ওই জুয়াড়ি যমরাজকে অনুনয় করে বলল— হে যমরাজ, আমার যদি কোনো পুণ্যকর্ম থাকে তবে অনুগ্রহ করে সেটা দেখুন। তখন যমরাজ চিত্রগুপ্তকে ওর কিছু পুণ্য কর্ম আছে কিনা দেখতে বললেন। চিত্রগুপ্ত খুঁজে দেখলেন যে সে একদিন শিবপুজো করেছিল। এবং তার ফলশ্রুতি সে তিন ঘণ্টার জন্য স্বর্গে রাজত্ব করতে পারবে ও ইন্দ্রের সিংহাসনেও বসতে পারবে। এই কথা শুনে ওই জুয়াড়ি তখন যমরাজকে বললো যে প্রথমে আমাকে আমার পুণ্য কর্মের ফল ভোগ করতে দিন, পরে সারা জীবন তো পড়েই আছে। তখন যমরাজ কৃপাবশত তাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিলেন। স্বর্গে দেবগুরু বৃহস্পতি যখন দেখলেন যে যমরাজ তাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই তিনি দেবতাদের বললেন— "এখন থেকে তিন ঘণ্টার জন্য এ স্বর্গের রাজা হবে। ইন্দ্রকে বললেন— তুমি তোমার সিংহাসন ছেড়ে দাও। তিন ঘণ্টা পরে তুমি আবার সিংহাসন ফিরে পাবে"। এই কথা শুনে ইন্দ্র সিংহাসন ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলে ওই জুয়াড়ি স্বর্গের রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলো। সে তখন ভাবতে লাগলো দেবাদিদেব মহাদেব ছাড়া আর কেউ বড় নয়। কারণ একদিন সে শিবের পুজো করেই স্বর্গে অল্প সময়ের জন্য হলেও রাজত্ব করতে পারলো। সুতরাং সে শিবের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লো এবং সে তার অধিকৃত সকল বস্তু শঙ্করকে নিবেদন করতে লাগলো, এমনকী ইন্দ্রের ঐরাবত হাতিও দান করে ফেলল অগস্ত্যমুনিকে, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব দান করলো বিশ্বামিত্র মুনিকে, কামধেনু গাভি দান করলো বশিষ্ঠমুনিকে আর চিন্তামণি রত্নটি দান করলো গালব ঋষিকে, কল্পবৃক্ষ উঠিয়ে এনে তা কৌণ্ডিন্য মুনিকে সমর্পণ করলো। এই ভাবে স্বর্গের যতসব দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য ধনরাজি ছিল তা সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিল। এই ভাবে তিন ঘণ্টা সময় উত্তীর্ণ হলে সে স্বর্গ থেকে চলে গেল।

তিন ঘণ্টা পরে ইন্দ্র ফিরে এসে দেখলেন অমরাবতী ঐশ্বর্যশূন্য হয়ে পড়ে আছে। তখন ইন্দ্র রাগে দেবগুরু বৃহস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে যমরাজের কাছে গিয়ে বললেন— "যমরাজ, আপনি একজন জঘন্য জুয়াড়িকে আমার পদ বা সিংহাসন দিয়ে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন। সে স্বর্গে গিয়েই অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছে। গোটা স্বর্গরাজ্যকেই একেবারে নিঃস্ব করে ফেলেছে। স্বর্গের যেসব জিনিস মহিমা বিস্তার করে তা সবই দান করে দিয়েছে। সে আমার কোষাগার থেকে সমস্ত ধন রত্ন দান করে দিয়েছে। এখন অমরাবতী শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে।"

ধর্মরাজ তখন ইন্দ্রের অনুযোগের উত্তরে বললেন— "হে দেবরাজ, আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত আপনার রাজ্যবিষয়ক আসক্তি দূর হয়নি। জুয়াড়ি সামান্য পুণ্যফলে যা ভোগ করতে পারলো তা আপনার মহান যজ্ঞের ফলেও সেরকম পুণ্যফল পাওয়া গেল না। সে স্বর্গ হস্তগত করেও তার প্রতি আসক্ত না হয়ে সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারলো। এর মতো মহত্ব আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তার এই নির্লোভ তাকে মহান করে দিয়েছে"।

'আপনি অগস্ত্য, বিশ্বমিত্র, বশিষ্ঠ আদি মহান ঋষিদের কাছে যান, তাঁরা আপনাকে আপনার স্বর্গের জিনিসগুলি দিয়ে দেবে, তা নিয়ে আপনি থাকুন।'

এদিকে জুয়াড়ি এত জিনিস নিঃস্বার্থ দান করার ফলে পাপভোগ অর্থাৎ নরকভোগ না করেই সেখানে বাস করতে লাগলো ও দেবতাদের আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হলো।

পৌরাণিক নগর

‘দ্বারকা’

গোপাল চক্রবর্তী

মহাভারত, হরিবংশ, বায়ু, ব্রহ্ম, অগ্নি এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে আনর্তদেশের রাজধানী কুশস্থলীতেই দ্বারকা নগরী স্থাপিত হয়। হরিবংশ অনুসারে রাজা ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতুষ্পুত্র আনর্ত কুশাস্থলী নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীকালে শর্যাতির বংশধরগণ কুশস্থলীর কর্তৃত্বলাভ করেন। পুণ্যজন রাক্ষস কুশস্থলী অধিকার করায় শর্যাতির বংশধরগণ ওই নগর ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কালক্রমে এই নগর পরিত্যক্ত হয়।

জামাতা কংসের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শ্বশুর জরাসন্ধ বারবার মথুরা আক্রমণ করে যাদবদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, তার সঙ্গে যুক্ত হয় কালযবনের আক্রমণ। এই উভয় আক্রমণে জর্জরিত শ্রীকৃষ্ণ তখন কুশস্থলীর জনহীন ভূখণ্ডে দ্বারকা নগরীর পত্তন করেন। গর্গ সংহিতায় দ্বারকা মাহাত্ম্যে বর্ণিত হয়েছে যে আনর্তের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের উপর দ্বারকাপুরী নির্মাণ করেন। সমুদ্র বেষ্টিত হওয়ায় এই নগর অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। জরাসন্ধ কিংবা কালযবনের পক্ষে এই সমুদ্র লঙ্ঘন করা দুঃসাধ্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের নেতৃত্বে যাদবরা দ্বারকায় এক শক্তিশালী বংশে পরিণত হয়েছিল। দ্বারকা দ্বীপে যাদববংশের ভয়ঙ্কর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তিত হয়ে পরেছিলেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে পিতা বসুদেব এক যজ্ঞ করেন, যজ্ঞে আগত মুনিদের পরীক্ষা করার জন্য যদুবালকরা কৃষ্ণ-জাম্ববতীর পুত্র অতি সুদর্শন শাম্বকে নারী সাজিয়ে তার পেটে এক মুষল বেঁধে মুনিদের কাছে জানতে চায় কবে সে প্রসব করবে? মহর্ষি দুর্বাসা ধ্যানস্থ হয়ে সম্যক অবগত হন এবং ক্রোধভরে অভিশাপ দেন, ‘এই বালক এক মুষল প্রসব করবে এবং সেই মুষল যদু বংশ ধ্বংসের কারণ হবে।’ কৃষ্ণের পরামর্শে যদুবালকেরা প্রভাস তীর্থে গিয়ে সেই মুষল ঘষে ঘষে ক্ষয় করতে থাকলে তা থেকে উৎপন্ন ফেনায় সৃষ্টি হয় নলখাগড়ার বন। কৃতবর্ম্মা-সাত্যকিদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় সেই নলখাগড়ার আঘাতে যাদবরা নিহত হয়। মুনির অভিশাপ ফলপ্রসু হয়। মুষলের অবশিষ্টাংশ দিয়ে তৈরি ফলার দ্বারা এক ব্যাধের হাতে শ্রীকৃষ্ণের দেহাবসান ঘটে। বলরাম যোগাসনে বসে দেহত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়— শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—

“কার্ত্তিকা পূর্ণিমা হবে, কৃত্তিকা নক্ষত্র
সেইদিন দ্বারাবতী গ্রাসিবে সমুদ্র।।”

(কাশীদাসীমহাভারত, মুষলপর্ব)

মহাভারত অনুযায়ী দ্বারকা প্লাবিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও কালক্রমে দ্বারকা পুনর্বার স্থাপিত হয়। প্রাচীনকালে দ্বারকা দ্বারাবতী নামেও অভিহিত হোত। বৈদিক যুগে দ্বারকার নাম তীর্থ রূপে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবতীর্থরূপে এর প্রসিদ্ধি থাকলেও এটি একটি বিশিষ্ট শৈবতীর্থ। শিবপুরাণ অনুসারে দ্বারকার জ্যোতির্লিঙ্গ হলেন নাগেশ শিব। এটি সপ্ততীর্থের অন্যতম।

প্রাচীন দ্বারকার অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। অনেকের মতে এটি জুনাগড় বা গিরিনগরে অবস্থিত ছিল। কারও কারও মতে বেট দ্বারকাই প্রাচীন দ্বারকা। কথিত আছে, বেট দ্বীপে ভগবান বিষ্ণু শঙ্খচূড় দৈত্যকে নিহত করে তার পত্নী তুলসীকে চারাগাছে পরিণত করেন। ওই গাছ পবিত্র তুলসী নামে খ্যাত। দ্বারকার মুখ্য মন্দির হলো রণ্‌ছোড়্‌জী রায়ের সাততলা মন্দির। ভারতবর্ষে পূর্ব, পশ্চিম উত্তর, দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত শঙ্করাচার্যের চারটি মঠ বা ধামের মধ্যে পশ্চিম ধামটি দ্বারকায় অবস্থিত।

ওখা বন্দর থেকে দ্বারকার দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার। আমেদাবাদ থেকে রেল পথে দ্বারকার দূরত্ব ৫৩২ কিলোমিটার। দ্বারকা থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে বেট দ্বারকা দ্বীপ।

DAS STEEL UDDYOG
Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda
সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার, গ্রীলগেট
এবং ফেব্রিকেশনের কাজ করা হয়
Show Room
—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—
GEETANJALI FURNITURE
Jhaljhalia, Station Road, Malda
Phone : 03512-266063, Mobile : 9733387091

বৈদিক গণিত

প্রাণতোষ বর্ধন

বিশাল গণিতশাস্ত্রের যে রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার সমস্ত কিছুই বৈদিক গণিত থেকেই নেওয়া। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে আমরা গণিতের কাজ করি তা সাধারণত বিশ্লেষণধর্মী, সময়সাপেক্ষ, বিরক্তিজনক ও ক্লান্তিদায়ক। কিন্তু বৈদিক পদ্ধতিতে গণিতের কার্যসাধন খুব আনন্দদায়ক। অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে শিক্ষার্থীরা নির্ণয় করতে পারবে ফলাফল। অভ্যাসের মাধ্যমে মনে মনে দ্রুতগতিতে উত্তরফল নির্ণয় করতে পারবে।

বৈদিক গণিতের সূত্রানুযায়ী কিভাবে দ্রুতগতিতে গুণন করা যায় তার কয়েকটি মাত্র নিদর্শন দেওয়া হলো।

(ক) 'একাধিকেন পূর্বেন' সূত্রানুসারে

উদাহরণ : ১. ধরা যাক 94×96-এর গুণফল নির্ণয় করতে হবে। এখানে একটু বিশেষ মনোযোগ সহাকারে দেখলে দেখা যায় এককের অঙ্কের যোগফল হচ্ছে (10) এবং পূর্বরাশি হলো (9)। এক্ষেত্রে করতে হবে 9 অঙ্কটির সঙ্গে 9-এর একাধিক অর্থাৎ (9+1)=(10) গুণ করা। তবে পাওয়া যাচ্ছে (9×10)=90 এবং এককের অঙ্কগুলির গুণফল বসানো। তবে গুণফল পাওয়া যায়=9024।

এই ভাবে উপরের সূত্রানুসারে করে দেখতে পারি :

98 × 92 77 × 73, 36 × 34,
75 × 75 105 × 105,123 × 127,
41 × 49.

'যাবদ্ উর্ধ্বম্' সূত্রানুসারে

উদাহরণ : ২. ধরা যাক 11 × 19 গুণফল করতে হবে। এখানে পদ্ধতিটির চাবিকাঠি হলো— সংখ্যা দু'টির আধার রাশি হলো = 10.

প্রথম সংখ্যাটি আধার রাশি হতে 1 বড় এবং দ্বিতীয় রাশিটি 9 বড়, এখানে (11)-এর সঙ্গে 9 যোগ করলে পাওয়া = 20, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আধার রাশি হতে বড় সংখ্যাগুলি গুণফল বসান হলো (9)। গুণফল হলো = 209.

উদাহরণ : ৩. 105 × 113 = 11865.

পদ্ধতি : এখানে আধার রাশি হলো (100), আধার রাশি হতে বড় সংখ্যাগুলির যোগফল বসানো হলো অর্থাৎ (105 + 13) = 118, তারপর আধার রাশি হতে বড় সংখ্যাগুলির গুণফল বসানো হলো অর্থাৎ (5×13) = 65. গুণফল পাওয়া গেল = 11865.

উদাহরণ : ৪. 109 × 113 = 12317.

পদ্ধতি : আধার রাশি হতে বড় সংখ্যাগুলির যোগ করা হলো। পাওয়া গেল (109 + 13) = অর্থাৎ 122. তারপর বড় অঙ্কগুলির গুণফল অর্থাৎ (9×13) = 117 পাওয়া যায়। এখানে আধার রাশি হলো (100), সেইজন্য গুণফলের বামদিকের অঙ্ক (1) পূর্ববর্তী সংখ্যার সঙ্গে যোগ করা হলো, অর্থাৎ 122 + 1 = 123.

```
 109
 113
-----
12217
   1
-----
12317
```

এইভাবে চেষ্টা করে দেখতে পারি :
101 × 147, 122 × 103, 116 × 105.

(খ) 'যাবদ্ উনম্' সূত্রানুসারে

উদাহরণ : ২. আধার রাশি (100) হতে কত কম তা নির্ণয় করে গুণ করা। ধরা যাক— 97 ×95 করতে হবে।

```
 97 -- 03
 95 -- 05
---------
 92 / 15
```

এখানে 97 সংখ্যাটি আধার রাশি (100) অপেক্ষা 3 কম, 95 সংখ্যাটি আধার রাশি অপেক্ষা 05 কম, এখন (97--05) বা (95--03) = 92 হলো বামাংশ, তারপর (03 × 05) = 15 হলো ডানদিকের অংশটি। সুতরাং গুণফল হলো = 9215. এই ভাবে চেষ্টা করে দেখতে পার : 88 × 98, 97 × 98, 93 ×93.

(৩) একন্যূনম্ (অর্থাৎ এক কম) এবং নিখিলং নবতঃ চরমং দশতঃ (অর্থাৎ বামদিকের অঙ্কগুলি 9 থেকে এবং একক অঙ্কটি 10 থেকে বিয়োগ করা)

ধরা যাক 345 × 999 গুণফল নির্ণয় করতে হবে। যখন কোন সংখ্যাকে কেবলমাত্র 999 দিয়ে গুণ করতে হবে তখন গুণক অঙ্কটি (345) থেকে (1) বিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ বাম অংশটি পাওয়া যাবে (344) এবং ডান অংশটিতে উত্তর হবে = (9 -- 3 = 6, 9 -- 4 = 5, 10 -- 5 = 5 অর্থাৎ 655)। সুতরাং পূর্ণ উত্তর হবে = 344655)

উদাহরণ : ৪. 1287 × 99

```
   1287
  13 : 87
----------
1274  13
```

এক্ষেত্রে গুণ্য সংখ্যাটি (1287) প্রথমে লেখা হলো। তারপর 'একাধিকেন পূর্বেন' সূত্রানুসারে অর্থাৎ গুণকের প্রথমাংশের থেকে। যোগ করে অর্থাৎ (12 + 1) = 13 সংখ্যাটি বসানো হলো 87 সংখ্যাটির নীচে এবং (87) সংখ্যাটি একটু পৃথক করে ডান দিকে বসানো হলো। তারপর 1287 থেকে 13 বিয়োগ করে বিয়োগফল (1274) বসানো হলো। ডান দিকের সংখ্যাটিকে পাওয়া যাবে নিখিলং নবতঃ চরমং দশতঃ সূত্রানুসারে অর্থাৎ (9--8 = 1) অর্থাৎ (10--7 = 3) সুতরাং গুণফলটি পাওয়া গেল 127413.

এইভাবে অতি সহজ পদ্ধতিতে করে দেখা যেতে পারে—
218 × 99 ; 4053 × 99 ; 392 × 99.
58792 × 99999 ; 765821 × 999999

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

(লেখক সংস্কৃত শিক্ষক, শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল)

বিজ্ঞান দিবসে প্রশান্তদের কাজ

কৌশিক গুহ

এবারে বিজ্ঞান দিবসের অনুষ্ঠান লাইব্রেরির মাঠে হবে— দুমাস আগেই বলেছিল প্রশান্ত। কয়েক বছর ধরে তার উদ্যোগেই সব আয়োজন। পারেও বটে। চিন্তাভাবনা পরিষ্কার। একা একা কাজ করে না। অনেকের পরামর্শ নেয়। একেকজনকে একটা দায়িত্ব দেয়। জেনে নেয় ভালো করে দায়িত্ব যাকে দেওয়া হচ্ছে সে রাজি কিনা, পারবে কিনা। প্রশান্ত সকলকে সাহায্য করবে। কার কোথায় অসুবিধে হচ্ছে জেনে নেবে। সমস্যার সমাধান করবে ঠাণ্ডা মাথায়। একটুও তাড়াহুড়ো করবে না। সকলকে নিয়ে কাজ করতে হয় কীভাবে সেটা জানে। প্রতিবছরেই নতুন কিছু ছেলে আসে। উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে। প্রশান্ত এই আয়োজনের মূল হলেও সে সবসময় বলে, সকলে মিলে কাজ। বড়োরা তার সঙ্গে কাজ করতে পেরে খুশি। ছোটোরাও। প্রশান্ত একটা সরকারি স্কুলে অঙ্ক পড়ায়। মন দিয়ে স্কুলে কাজ করে। কখনও টিউশনি করে বাড়তি আয়ের মতলবকে প্রশ্রয় দেয়নি। বরং বিনা পয়সায় অনেক গরিব ছেলেমেয়েকে পড়ায়। অনেকটা সময় কাটে তার বিজ্ঞান চেতনা জাগানোর

ভাবনায় আর কাজে। পাড়ার লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক। অন্যান্য লাইব্রেরিতেও যায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞান দিবস— এটা সকলকে মনে করিয়ে দেয়। প্রশান্ত ডাক দিলে সকলেই সাড়া দেওয়ার জন্যে তৈরি। কারণ তার কথার মধ্যে সৌজন্য আছে। সুন্দর ভাবে প্রয়োজনের কথাগুলো জানাতে পারে। ব্যবহার খুব ভালো। তার সঙ্গে কথা বলে বড়োরা খুশি হন। ছোটোরা অনেকেই তো তার ভক্ত। যা বলবে তাই শোনে। বেশিরভাগই বলে 'প্রশান্তদা'। বড়োরাও অনেকে বলে 'প্রশান্তদা'। সে জানিয়ে দিয়েছিল এবারের বিজ্ঞান দিবসের মূল বিষয় হবে : 'ক্যানসার সচেতনতা।' কীভাবে সব কাজ এগোবে ঠিক করে ফেলল। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগোল। ভালো কাজে টাকাপয়সার অভাব হয় না— এটা প্রশান্ত বার বার দেখেছে।

বিজ্ঞান মনস্কতা তৈরি করাই উদ্দেশ্য। সকলে মিলে নিজেদের একটু সচেতন রাখা— এই তো ব্যাপার। 'ক্যানসার' নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছেন সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়। নামকরা ডাক্তার। তিনি আসবেন বলেছেন। অনেকরকম কাগজপত্র দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন থাকবেন। প্রশান্ত আরও কয়েকজনের পরামর্শ ও সহযোগিতা চেয়েছিল। পেয়েছে। সারাদিন ধরে বিজ্ঞান দিবসের অনুষ্ঠান। একটা জায়গায় ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাথমিক চেতনা জাগানোর জন্যে সকলকে বলবে। মূল বিষয় থাকবে ক্যানসার নিয়ে। শুধু বক্তৃতা নয়। আলোচনা প্রশ্নোত্তর পরামর্শ। তথ্যচিত্র দেখানো। প্রদর্শনী থাকবে। 'ক্যানসার' বড় বেশি দাপট ছড়াচ্ছে। ওই অসুখের সঙ্গে লড়ার জন্যে সবরকমভাবে চেষ্টা চলেছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালাচ্ছেন ওই অসুখকে নিরাময় নিবারণ নিয়ন্ত্রণের জন্যে। আজ পাড়ায় পাড়ায় ক্যানসার রোগী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন, 'ব্যাধি বিলাসের এক নাম ক্যানসার।' ঠিক নয়, এই অসুখ বড় ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। সকলে সচেতন না হলে এই অসুখের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো কঠিন। প্রশান্তরা এই ভাবনাটা মাথায় রেখেছে।

সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, 'কয়েকটা ছোট ছোট ব্যাপার লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের। তাহলে পুরোপুরি না হোক এই অসুখকে চল্লিশ শতাংশ প্রতিরোধ করা যাবে। তামাক খাওয়া বন্ধ করা দরকার প্রথমেই। দাঁত আর মুখের যত্ন নিতে হবে সবসময়। রাতে খাওয়ার পর দাঁত মাজতে ভুললে চলবে না। বেশি করে খেতে হবে শাক-সবজি, ফলমূল। কমাতে হবে আমিষ জাতীয় খাবারের পরিমাণ। প্রতিদিন নিয়ম করে ঠিক সময়ে ব্যায়াম করা চাই। ছোটোদের খেলাধুলো করতে হবে। আসল কথা শরীর ঠিক রাখা চাই। শরীর ঠিক থাকলে কোনো অসুখ সহজে হামলা করতে পারে না। ফাস্ট-ফুড বড় বেশি আকর্ষণ জাগায়। জাঙ্ক-ফুড আর ফাস্ট-ফুড খাওয়া বন্ধ করতে হবে। হাঁটতে হবে খাটতে হবে। উলটোপালটা খাওয়ার লোভ ছাড়তে হবে। শরীর চর্চা ঠিকমতো করলে অসুখ সহজে কাছে ঘেঁষবে না।' সুবীর কত কথা বললেন সহজ করে। নানাবয়সী লোকজন গভীর আগ্রহে শুনল।

প্রশান্ত চারদিকে লক্ষ্য রাখছিল। অনেক দায়িত্ব তো। তার কিছুই শোনা হয়নি। পরে জেনে নেবে সব। অনুষ্ঠানের পুরোটাই তো ভিডিও রেকর্ডিং হয়েছে। দেখে নেবে। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগে সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় চলে যাওয়ার সময় প্রশান্ত বলল, 'সুবীরদা, ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে আর একবার ডাকবো। আসবেন তো?' সুবীর বললেন, 'তুমি ডাকলে আসতেই হবে।'

প্রশান্ত হাসল। সুবীরও।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

ছোটোদের বইয়ের আকর্ষণ অন্যরকম

নতুন দিল্লীতে বিশ্ব পুস্তক মেলার আসর বসেছিল ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখ থেকে। চলেছে ২৩ তারিখ পর্যন্ত। এই মেলার অনেকরকম আকর্ষণ থাকায় পাঠক আর প্রকাশকরা যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছেন। এ বছরের পুস্তকমেলায় প্রধান গুরুত্ব পায় শিশু সাহিত্য। ভাবনাটা এইরকম 'কথাসাগর : সেলিব্রেটিং চিলড্রেনস্ লিটেরেচার।' শিশু সাহিত্যের মধ্যে কতরকম বৈচিত্র্য। বহু ভাষায় লেখা বইয়ে বহুরকম সংস্কৃতির প্রকাশ দুই মলাটের মধ্যে। আমাদের দেশে গল্প বলার যে গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে সেই পরিচয়ও তুলে ধরা হয় ছোটোদের জন্যে তৈরি মণ্ডপে। 'গল্পের গল্প' নামে আকর্ষণীয় ভাবে সাজানো হয়েছিল ছোটদের প্যাভেলিয়ান। ছবি দিয়ে তুলে ধরা হয় ভারতীয় শিশু সাহিত্যের অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের কিছুটা রূপ। এটা প্রদর্শনীর একটা অংশ। আরও অনেক জিনিস ছিল জিজ্ঞাসু মন নিয়ে দেখার জন্যে।

মেলার একটা অংশ ছিল শুধু ছোটোদের জন্যে। যাঁরা ছোটোদের জন্যে লেখেন তাঁরা এসেছেন। সেখানে এসেছেন ছবি আঁকিয়েরা। আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছোটোরা অংশ নেওয়ায় ন-টা দিনের মেলা নিয়েছিল প্রাণবন্ত রূপ। নামী শিশু সাহিত্যিক, অলঙ্করণ শিল্পী, প্রকাশক, সমালোচকরা এসেছিলেন। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল দেশে ছোটোদের জন্যে তৈরি বই কোন্ কোন্ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। ছোটোদের বই আর ছোটোরা গুরুত্ব পাওয়ায় মেলা হয়ে উঠেছিল জমজমাট। ছোটোরা পেয়েছিল সেখানে অন্য জগৎ। যেখানে তাদের হারিয়ে যেতে কোনোরকম মানা ছিল না। একসঙ্গে কতরকম বই দেখার সুযোগ। বই তৈরি হয় কীভাবে তাও দেখার ব্যবস্থা ছিল। ছোটোদের হাতে নানারকম বই তুলে দেওয়ার জন্যে ভাবনাচিন্তা ছিল যথেষ্ট। ছোটোরা ছাপা শব্দের মধ্যে যাতে আকর্ষণ খুঁজে পায় সেজন্যে মণ্ডপকে মনকাড়া রূপ দেওয়া হয়েছিল। ছোটোদের জন্যে তৈরি বইয়ের প্রতি টান থাকে বড়োদেরও। কারণ অনেকেই মনের মধ্যে শৈশবকে ধরে রাখতে চান। মনে মনে পৌঁছোতেও চান। ছেলেবেলায় নতুন বইয়ের গন্ধ যেভাবে নিতেন এখনও সেভাবে নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নিয়ে মনকে অন্যরকম আনন্দে ভরে তুলতে চেয়েছেন। বড়োদের মধ্যে ওইরকম উৎসাহ দেখে ভালো লেগেছে ছোটোদের। বইয়ের প্রতি অনুরাগে বয়েস কোনোরকম বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

বইমিত্র

উলটো পালটা

১.

পরের লেখা নিজের নামে চালানোর কৌশল ভালোভাবে রপ্ত করেছে বিপুল নাগ। পুরনো বইপত্র জোগাড় করে। পত্রপত্রিকাও। তারপর তা থেকে কোনো অংশে টুকে নেয়। এইভাবে টোকার কাজ করে তিনটে জিনিস হয়েছে। প্রথমত, নাম একটু ছড়িয়েছে। বিপুল নাগ ভালো লেখে— লোকজন বলাবলি করে। দ্বিতীয়ত, লেখার সূত্রে আমদানি হচ্ছে অনেকটাই। তৃতীয়ত, কয়েক জায়গায় কদর মিলেছে। অনিল ঘোষ একটা কাগজের দুঁদে সাংবাদিক। বিপুলের তিনটে লেখা পড়ে দেখল। তিনরকম রীতিতে লেখা। অনিল বলল, 'শুনুন বিপুলবাবু, আপনার হাতের লেখা ভালো। কত জ্ঞান আপনার। আপনার একটা লেখা আমরা ব্যবহার করবো। তবে দুটো অংশ একটু বদলে দিয়ে যান।' বিপুল বলল, 'আমার হাতে এখন সময় নেই। কাল করে দেবো। লেখাটা দিন, নিয়ে যাই।' অনিল বলল, 'এখানে বসে করা যাবে না?' বিপুল বলল, 'আমার সময় নেই।' অনিল বলল, 'ঠিক আছে নিয়ে যান।' পরের দিন বিপুল লেখাটা নিয়ে গেলো। অনিল ভালোভাবে

আপ্যায়নের পর বলল, 'আপনার ভাবনার সঙ্গে হুবহু মিল দেখা যাচ্ছে ১৯২০ সালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত একটা লেখার। আপনি ২০১৪-তে যা ভেবেছেন তার সঙ্গে এত মিল কীভাবে ঘটল অতবছর আগে প্রকাশিত লেখার— সেটাই চিন্তা করছি। আপনি যে দুটো প্যারা নিজের মতো যোগ করেছিলেন সে দুটো বদলাতে বলেছিলাম। সেই পুরনো লেখার প্যারা দুটো ঢুকিয়ে নিয়ে এসেছেন। এই দেখুন।' সামনে প্রবাসীর বাঁধানো সংখ্যা মেলে দিলো অনিল। ধরা পড়ে বিপুল নাগ তখন পালাবার পথ খুঁজতে লাগল।

২.

সুজন ক্লাস ওয়ানে পড়ে। চটপটে। অনেক কথা বলে। সকলে তাকে পছন্দ করে। অচেনা লোকজনের সঙ্গে সহজে পরিচয় করে নেয়। সকালে মায়ের সঙ্গে স্কুলে যায়। কোনো কোনো দিন পুলিশকাকু তাকে রিকশো চড়ে আসতে দেখে হাত তুলে গাড়ি থামিয়ে দেয় যাতে তার স্কুলে যেতে দেরি না হয়।

সেদিন ওকে ক্লাসে জিগগেস করলেন নমিতা আন্টি, 'গীতা কি?' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল সুজন, 'গীতা একটি লাল বই। পিসিমা পড়ে।' হাসতে হাসতে তার পিঠ চাপড়ে দিলেন নমিতা আন্টি।

রামগরুড় সংকলিত

নারী নিগ্রহ—একটি অভিশাপ

শুভশ্রী দাস

গত বছর কোনো একটি সমাবেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত সারা দেশে নারী নিগ্রহের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মন্তব্য করেছিলেন— 'ভারতে নয়, ইন্ডিয়াতে এগুলি বেশি ঘটছে।' দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী এই মন্তব্যের প্ররিপ্রেক্ষিতে রেরে করে উঠেছিলেন। বস্তুতপক্ষে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির বাড়বাড়ন্তের এবং ভারতীয় পরম্পরা ও মূল্যবোধকে অবহেলা করার জন্যই এগুলি ঘটছে তিনি বলতে চেয়েছিলেন।

দেশের শিক্ষিত মানুষ অবগত আছেন নারী নিগ্রহের ঘটনাগুলি শহরেই বেশি ঘটছে। সারাদেশে দশ লক্ষের বেশি জনসংখ্যাযুক্ত ৫৩টি মহানগর আছে। এই মহানগরগুলিতে ২০১১ সালে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছিল ৩৩ হাজার ৭৮৯টি। এই মহানগরগুলির একত্রিত অপরাধ সংখ্যা ২১ শতাংশ, যা সারাদেশের মহিলাদের ওপর অত্যাচার থেকে বেশি। মহানগরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হয়েছে দিল্লীতে। ২০১১ সালে ওই অত্যাচারের সংখ্যা ৪,৪৮৯টি। মহানগরগুলিতে নারীনিগ্রহের মতো অপরাধ ১৩.৩ শতাংশ। এরপরই ভারতের বিজ্ঞাননগরী ব্যাঙ্গালুরুতে এই অপরাধের সংখ্যা ১৮৯০টি অর্থাৎ ৫৬ শতাংশ। হায়দরাবাদে ১৮৬০টি (৫.৫ শতাংশ) ও বিজয়ওয়াড়াতে ১৭৯৭টি (৫.৩ শতাংশ)। অর্থাৎ যেখানে প্রগতিশীলতার নামে ভারতীয় পরম্পরাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে সেই শহরগুলিতে নারী নিগ্রহ বেশি ঘটছে।

অঙ্গনা

রাজধানী দিল্লীকে মহিলাদের প্রতি অন্যায়, অত্যাচারের খনি বলা হচ্ছে। এখানে মোট অপরাধের মধ্যে বলাৎকার ১৭.৬ শতাংশ, অপহরণ ৩১.৮ শতাংশ, পণপ্রথার বলি ৪৪ শতাংশ ও শ্লীলতাহানির ১০.১ শতাংশ। অন্ধ্রপ্রদেশের বিজওয়াড়ায় শ্লীলতাহানির সর্বাধিক ১৮ শতাংশ। এ সমস্ত তথ্য 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস্ ব্যুরো' থেকে পাওয়া।

আসলে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের ফলে সামাজিক মূল্যবোধের স্তর তলানিতে ঠেকেছে। অভিভাবকরাই ছেলেমেয়েদের বিগড়ে দিচ্ছেন। বিজ্ঞাপনে বা টিভিতে দেখা পোশাক তা যতই অশালীন হোক না কেন কিনে দিচ্ছেন। তাদের সংযম ও অনুশাসন শেখানো হচ্ছে না। প্রগতির নামে তাদের মোবাইল, ইন্টারনেটের বশীভূত করে দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যালয়ে 'জীবনশৈলী' শিক্ষার নামে যৌনশিক্ষার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের কৌতূহল নির্মাণ করা হচ্ছে। ভারতীয় মূল্যবোধে যৌন চেতনা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, একে শিক্ষা দেওয়ার কোনো আবশ্যকতাই নেই। যৌনশিক্ষার ফলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে তীব্র উৎসুকতা নির্মাণ হওয়ায় তা পরখ করে দেখার ইচ্ছাও তীব্র হচ্ছে। কলকাতা-সহ ভারতের অন্যান্য মহানগরের রাস্তায় বা পার্কে ছেলেমেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে আমাদের দেশে ৭০ থেকে ৮০-র দশক পর্যন্ত পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ প্রায় দেখা যেত না। মহিলারা একা চলাফেরা করতে কোনোরূপ খারাপ অনুভব করতেন না। কিন্তু ধীরে ধীরে টিভি-র ধারাবাহিক, বিজ্ঞাপন ও সিনেমায় মহিলাদের অশ্লীলচিত্র, দৃশ্য, হাবভাব, পোশাক-আশাক ইত্যাদি দেখানোর ফলে দর্শকের ওপর পরিণাম হতে শুরু করে। এর ফলেও এক শ্রেণীর পুরুষের মানসিকতা ও আচরণ বিকৃত হতে শুরু করে। আমরা জেনে শুনেও ঘরে বসে বা রাস্তায় চলতে ফিরতে এগুলি উপভোগ করছি। যখন এরকম ধারাবাহিক বা বিজ্ঞাপন দেখি তখন তার টি আর পি বেড়ে যায়। যদি না দেখা যায় টি আর পি কমে যাবে। এরকম দৃশ্য বদল করা দর্শকের ওপরই নির্ভর করে। নির্মাতা, নির্দেশক, লেখক, শিল্পী ও বিজ্ঞাপনকর্তাদের এটা ব্যবসামাত্র। প্রগতিশীলতার নাম দিয়ে আমরা এগুলো উপভোগ করে চলেছি। মহিলাদের শালীনতা বর্জিত পোশাক নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে 'নারীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ' বলে আবার আমরা চিৎকার করতে থাকি।

অভিনেত্রী তেজস্বিনী পণ্ডিত মনে করেন পাশ্চাত্য প্রভাবে খুব কম বয়স থেকে ইন্টারনেটে পর্নোসাইট দেখার ফলে এক শ্রেণীর ছেলেমেয়ের রুচিবিকৃতি ঘটার কারণেও মহিলাদের ওপর অত্যাচার বাড়ছে। সংবেদনশীল বিষয়ের ফিল্ম ডাইরেক্টর সুমিত্রা ভাবে বলেন— দেশে আর্থিক সম্পন্নতা এসেছে, শিক্ষা-দীক্ষা বেড়েছে, কিন্তু মূল্যবোধ কমেছে দেখা যাচ্ছে। নারীকে মানুষ না ভেবে উপভোগ্য বস্তুরূপে দেখার প্রবণতা বেড়েছে। প্রত্যেকে পয়সার পিছনে ছুটছে। আপনত্বের ভাবনা কমে যাচ্ছে। শুধুমাত্র 'আমার এতেই মানুষ আত্মমগ্ন থাকছে।

বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আশিস মুখোপাধ্যায়ের মতে— "সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্যই বাড়ছে নারী নিগ্রহের মতো ঘটনা। বলা যেতে পারে পশ্চিমের ফেলে দেওয়া সংস্কৃতি অর্থাৎ যৌথ পরিবার না রাখা, অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা মানসিকতা, পশ্চিমের পোশাক-আশাককে অন্ধভাবে অনুকরণ করা— এ সবই ঢেউয়ের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশকে গ্রাস করেছে। যার শিকার হচ্ছে মেয়েরা।"

গত ৩৪ বছর একটি অভারতীয় দর্শনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের শাসনে পুরুষের নৈতিকতার ওপর প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। এই সময়কালের মধ্যে যাদের জন্ম ও বড় হওয়া তারা মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দ্রষ্টাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের মতে, "অধিকাংশ লোকেরই মন বিশেষভাবে শরীরের অধীন, তাহাদের মন অতি অল্প বিকশিত।... অধিকাংশ মানুষ পশু হইতে অতি অল্পই উন্নত।" সুতরাং ৩৪ বছরের রাজত্বকালে মানুষের মনকে দেবত্বে উন্নীত না করে পশুত্বে অবনমিত করা হয়েছে। তাই এই অভিশাপ। আর এই অভিশাপের বোঝা এন সি আর বি-র হিসাব অনুসারে শুধুমাত্র এই রাজ্যেই ২৯ হাজার ১৩৩টি। এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর কালের গর্ভে ছেড়ে না দিয়ে সবাই মিলে 'ইন্ডিয়া' নয় ভারত-কে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

সিপিএম নিশ্চিত ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলা কি উঠছে?

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

হঠাৎ করে এসে পড়া কোনো লোকের হয়ত ঠিক নজরে আসবে না যে এই হতভাগ্য রাজ্যটি প্রায় ৩৪ বছরের (১৯৭৭-২০১১) সময়কাল বামপন্থীর একচ্ছত্র কব্জায় ছিল। যদিও একেবারে সম্প্রতি সেই পুরোনো জমানার মতো ব্রিগেড প্যারেড মাঠের সমাবেশ ঘিরে বেশ কিছু দেওয়াল লিখন চোখে পড়বে। কিছু কিছু রক্ত পতাকাও ব্যস্ত পথসঙ্গমগুলিতে স্তিমিতভাবে উড্ডীয়মান ছিল, তবুও মাত্র তিন বছর আগেকার রাজ্যের ট্রেডমার্ক দোর্দণ্ডপ্রতাপ বামমার্গী হম্বিতম্বির তিল মাত্র ছিল না। হালফিল মানুষের মধ্যে সিপিএমের নেতাদের নাম নিতেই দেখা যায় না। সবচেয়ে বড়কথা, চাপা গলায় কীর্তিমান লোকাল কমিটির সদস্যদের পুণ্যকীর্তিগুলি নিয়েও আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। দেখে শুনে মনে হবে এ সবই যেন কোনো সুদূর অতীতের কোনো কল্পকথা।

বাস্তবিক পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীরা কি হারে (রেটে) যে মুছে গেছে তা আজ ভাবা যায় না। এই কদিন আগের রাজ্যসভা ভোটে দলের ফতোয়া অমান্য করে বামফ্রন্টের তিন বিধায়ক (ছোট দলের হলেও) অকাতরে তৃণমূল প্রার্থীকে জিতিয়ে দিলেন। এমন ঘটনা মাত্র কয়েক বছর আগে অকল্পনীয় ছিল। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো দিন কয়েক আগেই সিপিএমের হতবুদ্ধি ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ করে পশ্চিম মেদিনীপুরের এক সভায় স্বীকার করলেন 'নেতাই কাণ্ডে' তাঁদের ক্যাডারদের গুলি চালানো ভয়ঙ্কর ভুল হয়েছিল। প্রত্যুত্তরে তূরীয় ব্যঙ্গ করলেন দলেরই প্রবীণ সদস্য রেজ্জাক মোল্লা। কোনোদিন মুখ্যমন্ত্রী না বলে বসেন তাঁর মুখ্যমন্ত্রী হওয়াটাই ভুল হয়েছিল। দল এর পরও প্রতিক্রিয়াহীন। নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে ঘিরে দলের অভ্যন্তরে তীব্র অসন্তোষ দেখা গেছে। বুদ্ধবাবু দলের প্রধান মুখ হওয়ায় পদ্ধতিগতভাবে তাঁর বিরোধিতা করার সাহস না দেখাতে পারলেও তাঁর বক্তব্যে হতমান দলের সদস্যরা যে আরও হতোদ্যম হয়ে পড়বে সেকথা অনেকেই বলাবলি করছেন।

বাম উদ্বিগ্নতা

সিপিএমের উদ্বিগ্নতার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। অতীতে অত্যধিক মাত্রায় দল গ্রামীণ সমর্থন নির্ভর হয়ে পড়েছিল। গ্রামীণ জনতাকে যে প্রকারে তারা হাতের মুঠোয় রেখেছিল, এমনকী ২০১১ সালের তুমুল পরাজয়ের পরও দলের অনেক তথাকথিত ভোট বিশারদ হিসেব করতেন— মাটির গভীরে চলে যাওয়া শিকড়ের মতো গ্রামীণ মানুষের ওপর তাঁদের প্রভাব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দমে একটু ঘাটতি পড়লেও তাদের আবার ঘুরিয়ে দাঁড় করাবে। কিন্তু গত বছরের সারা বাঙলা জোড়া পঞ্চায়েত নির্বাচনে এ আশায় ছাই পড়ে গেল। বাস্তবে শহরাঞ্চলে নারী নিগ্রহ, অত্যাচারের প্রসঙ্গে মমতার অসংবেদনশীল বক্তব্য প্রায়শই নাগরিকদের ক্রুদ্ধ করলেও বিগত তিন বছরে তিনি গ্রামে দলকে অনেক এগিয়ে নিতে শুধু নয়, মানুষের কাছে নিয়ে যেতে সফল হয়েছেন। বাস্তবে, গ্রামে মমতার পক্ষে এই রাজনৈতিক পালাবদল ও বজ্রমুষ্টি কায়েম করার ক্ষেত্রে অনেকটাই তাৎক্ষণিক পাইয়ে দেওয়া ও ভীতি প্রদর্শনের পন্থার সুফল বা কুফল। তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে এটা সেই ১৯৭৭ পরবর্তী সিপিএমই কায়দারই চাকতি চাকতি অনুকরণ। বামপন্থীরা এখনও কিছু দূরবর্তী জেলায় তাদের আংশিক প্রভাব ধরে রাখতে পারলেও বাঙলার বিপুল প্রাণকেন্দ্র ও কলকাতার ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চলগুলিতে লাল পতাকাকে হটিয়ে তৃণমূলী ত্রিবর্ণ পতাকা পত পত করে উড়ছে। এই সেদিনও যে লোকগুলি বামেদের হয়ে শরীরের মাসল দেখাত তারা কি মসৃণভাবে দিক পরিবর্তন করে নিয়েছে। এটা ঠিকই আজ সিপিএম তাদের ঘরছাড়া সমর্থকদের পক্ষে যে করুণ আর্তনাদ করছে তা যথার্থ। কিন্তু হায়! তাদের থেকে তো কেউ ভাল জানে না রাজনৈতিক হানাহানির এই ব্যুমেরাং হওয়ার সংস্কৃতির তারাই হোতা। তৃণমূলের এই প্রতিশোধের রাজনীতি সমর্থনযোগ্য না হলেও পশ্চিমবঙ্গে বহমান ধারাই হলো প্রতিস্পর্ধী হিংসার রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

মমতার বল

মমতার এই বাড়বাড়ন্তের চাবিকাঠি কিন্তু রয়েছে মুসলিমদের হাতে। এদের উল্লেখযোগ্য সমর্থনেই তাঁর এত রমরমা। এটা বিদায়ী বামফ্রন্টের শেষ বছরগুলির সময় থেকেই প্রকট হতে থাকে। সভাগুলিতে গত ৩১.১.১৪-র বিশাল সভায় টিপু সুলতান মসজিদের ইমামের উপস্থিতিই মমতার পক্ষে প্রবল গোষ্ঠীবদ্ধ মুসলিম সমর্থনের অকাট্য প্রমাণ। একটা সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে মুসলিম জনতার ওপর কংগ্রেসের একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। কিন্তু ক্রমে তা যে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে প্রয়াত খান চৌধুরি পরিবারের একাধিক সদস্যের তৃণমূলে যোগদানেই তা বোঝা যায়। এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার, ২০০৯ বা ২০১১ সালের মতো নির্বাচনে ত্রিমুখী (কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম) প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে বাম বিরোধী ভোট ভাগ হওয়ার চিন্তায় মমতা আর ভীত নন। এক্ষেত্রে অল্প হলেও

বিজেপি-ও তাঁর কর্তব্যে নেই। লক্ষণীয় ২০১১-র নির্বাচনের পর থেকেই বামশক্তি আর মূল প্রতিপক্ষ নয়। তাই এমন নির্বাচনী লড়াই আর বাম ও বামবিরোধিতার অভ্যস্ত ধারায় হবে না। দান পালটে গিয়ে এখন তা অত্যন্ত প্রভাবশালী তৃণমূল বনাম নানা দলে বিভক্ত তৃণমূল-বিরোধী ভোট। এই সব হিসেব-নিকেশ মাথায় রেখেই এ রাজ্যের ভোট পণ্ডিতদের ভবিষ্যদ্বাণী— মমতা অন্তত ৩৫টি আসন নিয়ে এবার দিল্লী যাবেন। সবাই জানে ২০১৪-র লোকসভা ত্রিশঙ্কু হলে একটি দলের তাঁবুতে ৩৫ জন সাংসদ থাকলে তারা কি বিপুল ক্ষমতাধর হয়ে উঠবে।

পশ্চিমবঙ্গ

এমন একটা পরিস্থিতি এসে যাওয়া বামেদের পক্ষে চরম বেদনার। কেননা অতীতে বহুবারই পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যার জোরেই তারা দিল্লীতে তুলমূল্য সর্বভারতীয় উপস্থিতির নিরিখে নগণ্য হলেও লাঠি ঘোরাত। অনেক সময় সর্বভারতীয় রাজনীতির অভিমুখও পাল্টে দিত। আজও তাদের আবার সেই সাধ, সেই অভিসন্ধিই দেখা যাচ্ছে। তারা মুলায়ম ও জয়ললিতার কাঁধে ভর করে তৃতীয় ফ্রন্টকে বাঁচিয়ে তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তবে এবার পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। তাই তাদের এই মরিয়া চেষ্টাতেও নিজেদেরই কোনো আত্মবিশ্বাস নেই। তারাও জানে— যে কংগ্রেসের ভরসায় তারা এত লম্ফঝম্ফ করছে তারা প্রতিটি দিনের চলে যাওয়া সূর্যাস্তের সঙ্গেই আরও অস্তমিত হয়ে যাচ্ছে। যে আর উঠবে না। সর্বোপরি রয়েছেন মমতা। যাঁর সিপিএমের প্রতি তীব্র বিজাতীয় ঘৃণা কমরেডদের জায়গা নির্দিষ্ট করে দিতে জান প্রাণ লড়িয়ে দেবে। আর সেই জায়গাটা হলো সর্বভারতীয় রাজনীতির মূল মাঠ নয়, মাঠের আশেপাশে। কিন্তু এত সব হলেও অর্থাৎ মমতা যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় এক বিরাট রাজনৈতিক শক্তি তা মেনে নিলেও পশ্চিমবঙ্গবাসীর আশঙ্কার কারণ অন্য। আর তা হলো মমতার ভোটের ভরকেন্দ্র।

মূলত সমাজের যে অংশের দৌলতে তিনি নির্ণায়ক ভূমিকায় যাচ্ছেন সেই ভূমিকাকে বাঙলার উন্নয়নে, বিকাশে সদ্ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রীয় নীতি-নির্ধারণে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তাঁর সমর্থনের কেন্দ্রবিন্দু হারানোর চিন্তা তাঁকে রাজনীতির প্রান্তিকতায়, প্রাদোশিকতাকেই আটকে রাখবে। তাঁর মুক্তি আপাতত দৃশ্যমান নয়।

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

Sharada Travels

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মণ্ডল — 9874398337

ভ্রমণ	মুখ্য দর্শনীয় স্থান	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য
গোয়া	উত্তর গোয়া ও দক্ষিন গোয়া	৮	১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৪	৭,৫০০/-
হরিদ্বার	হরিদ্বার-হৃষিকেশ- লক্ষ্মনঝোলা - দেরাদুন- মুসৌরী	৮	২১শে মার্চ, ২০১৪	৬,৫০০/-
উত্তর ভারত	হরিদ্বার, হৃষিকেশ, মুসৌরী, দেরাদুন, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, সারনাথ, বেনারস	১২	২১শে মার্চ, ২০১৪	১০,০০০/-
কাশ্মীর	অমৃতসর, জম্মু, শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাঁও, বৈষ্ণোদেবী	১৩	৯ই এপ্রিল, ২০১৪	১৩,০০০/-
সিকিম	গ্যাংটক, ছাঙ্গুলেক, বাবা মন্দির, নামচি, সান্দ্রুপচী, চারধাম, পেলিং, ইয়ুমথাং	৯	৩০শে এপ্রিল, ২০১৪	৮,৫০০/-
হিমাচল	সিমলা- কুফরি- মানালী- রোটাংপাস- কুলু- মনিকরণ	১১	২১শে মে, ২০১৪	১০,০০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর তিন মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস), বড়/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ, ডিনার (আমিষ/নিরামিষ), টোল ট্যাক্স, গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া, ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে, হাতি/ঘোড়া চাপা, পুজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

✷ ভ্রমণ শুরু ও শেষ, হাওড়া/শিয়ালদহ/ কোলকাতা অথবা উল্লেখ্য নির্দিষ্ট কোন স্থান থেকে ✷ হঠাৎ করে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি অথবা ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে প্যাকেজ মূল্য বর্ধিত হবে। ✷ বালক / বালিকাদের ক্ষেত্রে (৫-১১ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ৭৫% টাকা লাগবে। শিশুদের ক্ষেত্রে (২-৪ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ২৫% টাকা লাগবে।

তামিলনাড়ুর মহিলারা ভারতীয় পারিবারিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারে সংকল্পবদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। তামিলনাড়ুর মহিলারা এক নীরব বিপ্লব করে চলেছেন। তাঁরা স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের ভারতীয় ভাবধারায় গড়ে তোলার কাজ করছেন। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় জানা গেছে যে, সেই রাজ্যের ছাত্রীরা তাদের পরিবারে আদর্শ আছেন। এঁদের মধ্যে আছেন পেশাদার উদ্যোগী, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, কর্পোরেট কেউকেটা, শিল্পীসহ সমাজসেবী। এঁরা এই বার্তা দিতে চান যে, মহিলাদের সাফল্যকে মর্যাদা দিতে এদেশে অতীতে অনেক ঘটনা ঘটেছে যা অন্যদেশে ঘটেনি।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-সার্ধশতবর্ষে নারী অংশগ্রহণ কার্যক্রমের প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি আরো জানান, অতীতে ভারত মূল্যবোধ এবং নারীর মর্যাদা, ঐতিহ্য বিদেশে রপ্তানি করত বরং আমরা সেই সময়ে পশ্চিমি অধিকার ভিত্তিক, পুরাতন ব্যর্থ ধ্যান-ধারণা

স্বামীজীর সার্ধজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তামিলনাড়ুর মহিলারা পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষার সংকল্প গ্রহণ করছেন।

নারীর ভূমিকা পালন করছে এবং সেই সঙ্গে নিজ নিজ সম্প্রদায়ে, সমাজজীবনে এবং সর্বোপরি নিজেদের দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং সেই সঙ্গে নিজ নিজ সম্প্রদায়ে, সমাজজীবনে এবং সর্বোপরি নিজেদের দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চায়।

এইসব মহিলারা আদর্শ সমাজ, দেশ, পরিবার গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পেশায় নিযুক্ত

২৩ জানুয়ারি চেন্নাইয়ে এক সমাবেশে স্থির হয় যে, সারা রাজ্যে মহিলা উদ্যোগ নিয়ে কাজ করা হবে। স্থির হয় যে, এই অধ্যায়ে রাজ্যজুড়ে যে সমস্ত মহিলা বিভিন্নক্ষেত্রে যে পারদর্শিতার নিদর্শন দেখিয়েছেন, তার প্রদর্শনী করা হবে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং দেখানো হবে জাতীয় পরিবার পদ্ধতিতে নারীদের মর্যাদাপূর্ণ অংশগ্রহণের কথা। —এই বার্তা দিলেন প্রখ্যাত নৃত্যবিদ পদ্মা সুব্রহ্মণ্যম যিনি প্রত্যাখ্যান করেছি।

সুব্রহ্মণ্যমদের মতো সুচিন্তক মহিলারা আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রীদের কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করেছেন। ‘‘যারা এইসব বিষয় নিয়ে কাজকর্ম করছেন তাঁরা ছাত্রীদের মায়েদের বোঝাচ্ছেন যে, মায়েরা যেন অযথা ভীত না হন যে, তাঁদের মেয়েরা বিবাহপূর্ব অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়লে। এঁদের যুক্তি হলো আধুনিক যুগে উদারতার হাওয়ায় এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। তিনি

বলেছেন যে, এই উদারতার ফলে পশ্চিমি ব্যর্থ আদর্শগুলি এদেশে আমদানি হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০তম জন্ম-বার্ষিকী ২০১৩-১৪ সালে উদযাপন নারীসত্তার পক্ষে বিরাট আশার আলো নিয়ে এসেছে। স্বামীজী বলতেন, ''ভারতীয় রমণীরা বাইরের দুনিয়াকে নেতৃত্ব দেবে। এই বিশ্বাস ও আস্থা তিনি যে ভারতীয় নারীদের ওপর রেখেছেন তাঁরাই আমাদের পথ দেখিয়েছেন'' —সুব্রহ্মণ্যম বললেন।

কে সান্তার মতো র‍্যামন ম্যাগসেসে সম্মানে ভূষিত ব্যক্তিত্ব এবং বিখ্যাত ক্যানসার বিশেষজ্ঞ এই আন্দোলনের পথিকৃৎ। ''আমরা চাই আরো বেশি মাত্রায় মহিলাদের ক্ষমতা প্রদান করা হোক, তার অর্থ এই নয় যে মহিলার পানশালায় গিয়ে সুরা পানে লিপ্ত থাকবে। মহিলাদের ক্ষমতা প্রদান এখন বাস্তব এবং এই ক্ষমতার অর্থ হলো তারা তাদের ক্ষমতা কতটা রূপায়ণে সক্ষম। একজন মহিলা ক্ষমতাবান হয়েছে কিনা তা বোঝা যাবে মহিলারা তার অধিকার অর্জনে কতটা সে প্রশিক্ষিত হয়েছে এবং সেই অধিকার কতটা তারা প্রয়োগ করতে পারছে'' —সান্তা একথা বললেন।

তিনি তাদের ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ যারা বিবাহকে খাটো চোখে দেখে। তাঁর মতে বিবাহ হলো এক পবিত্র বন্ধন। বিবাহকে ছোট করে দেখলে চলবে না, যা এখন দেখা হয়ে থাকে।

'গোল্ডম্যান সাচ' (Goldman Sachs) থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে সুব্রহ্মণ্যম জানালেন যে, দুনিয়া জুড়ে ব্যাপক আর্থিক মন্দা ভারতে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি, তার অন্যতম কারণ হলো পরিবারের বন্ধনের জন্য 'বাড়িতে মহিলারা যে সঞ্চয় করে তা দেশের আর্থিক সংহতিতে বিরাট ভূমিকা নিয়ে থাকে। সরকার এই সঞ্চয় ব্যবহার করছে দেশের পরিকাঠামো তৈরির প্রোগ্রামে'। তিনি এই তথ্য দেন গোল্ডম্যান সাচ (২০১০) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে।

সুব্রহ্মণ্যম ও অখিলা শ্রীনিবাসন উল্লেখ করেন যে, আমেরিকায় প্রচলিত সহবাস এবং অধিকার-নির্ভর সমাজব্যবস্থা সে দেশে পরিবারতন্ত্রকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। ''আমেরিকায় রাজকোষের অর্থ ব্যয় হচ্ছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অক্ষম এবং অসহায় মানুষদের রক্ষণাবেক্ষণে আর এই ভাবে সে দেশের অর্থনীতি দেউলিয়া হচ্ছে। সমাজ সুরক্ষা করতে মার্কিন সরকার ব্যাপকভাবে বাজার থেকে ঋণ নিচ্ছে'' —এটি শ্রীনিবাসনের কথা যিনি শ্রীরাম জীবনবীমা সংস্থার একজন কর্ত্রী।

সংস্থার সংগঠকরা উদ্বিগ্ন এবং বিচলিত এই ভেবে যে, চেন্নাই হাইকোর্টে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ডঃ লক্ষ্মী বিজয়কুমার যিনি একজন মনস্তত্ত্ববিদ জানালেন— কেবলমাত্র চেন্নাই শহরে গত একদশকে বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়েছে পঞ্চাশ শতাংশ। চেন্নাইয়ে এক দশক আগে যেখানে পারিবারিক আদালত ছিল একটি এখন তা বেড়ে হয়েছে ছয়টি।

এস. গুরুমূর্তি যিনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এবং প্রখ্যাত লেখক, সভায় বললেন যে, নতুন প্রজন্মের কাছে ভারতীয় পরিবারতন্ত্র অজানা এবং সেখানে মহিলাদের ভূমিকা কী সে বিষয়েও তারা অজ্ঞ। আমাদের সমাজ স্মরণাতীত কাল থেকে পরিবারকেন্দ্রিক। মহিলাদের ভূমিকা সেখানে প্রধান। তাদের সঞ্চয়ী মনোভাব পরিবারকে সাহায্য করে। গুরুমূর্তির কথায়, ''অধিকার অর্জনের অর্থনীতিতে কেউ কারুর পাশে দাঁড়ায় না— এমতাবস্থায় পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্র।''

গুরুমূর্তি যিনি সাতরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি-নৃতত্ত্বের এক সাম্মানিক অধ্যাপক, আরো বলেন, ''আমেরিকায় পূর্ব নির্ধারিত বিবাহ ধীরে ধীরে বর্জিত হচ্ছে এবং বর্তমানে তা মাত্র দশ শতাংশ। সে দেশে প্রথম বিবাহের অর্ধেক, দ্বিতীয় বিবাহের দুই তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয় বিবাহের তিন চতুর্থাংশ শেষ হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদে। পারিবারিক গণ্ডগোলের ফলে প্রায় আধা মার্কিনবাসী পিতৃহীন, একজন অভিভাবক অথবা বিবাহবর্জিত এবং একচল্লিশ শতাংশ শিশু জন্মাচ্ছে কুমারী মাতার গর্ভে। এসব হলো অবাধ স্বাধীনতার বিষফল এবং নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের কুফল।'' তিনি আরো বলেন, 'Fatherless America' পুস্তকের প্রণেতা ডেভিড ব্লানকেনহর্ন জানিয়েছেন যে, আমেরিকা অরাজকতায় দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।''

স্বামীজী জন্ম সার্ধশতবর্ষে তামিলনাড়ুর মহিলাদের এই বিশেষ উদ্যোগ সারা ভারতে মহিলাদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। তাঁরা এই নারীশক্তি জাগরণ আন্দোলন শুধুমাত্র আলাপ-আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; স্কুল-কলেজের সঙ্গে সঙ্গে শহর-গ্রামের মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করছেন। রাজ্যের বহু স্থানে 'পারিবারিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারে ভারতীয় নারীর ভূমিকা ' বিষয়ক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লেখার প্রতিযোগিতার কার্যক্রম করছেন। এজন্য স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের পুরস্কার স্বরূপ ২ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন।

হিন্দুত্ব রক্ষায় চাই তাত্ত্বিক ক্ষত্রিয়

অমলেশ মিশ্র

ভারতবর্ষের প্রচারমাধ্যমগুলির আপ্রাণ চেষ্টা থাকে যাতে হিন্দু নির্যাতন-নিপীড়নের কোনও সংবাদ প্রকাশিত না হয়। এই ক্ষেত্রে বহু তাত্ত্বিক যুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিকরা মূলত হিন্দুবিদ্বেষী, মার্কসীয়তত্ত্ব ঘেঁসা এবং পাশ্চাত্যপ্রেমী।

এদেশের কিছু হিন্দুগোষ্ঠী আছেন যাঁরা মনে প্রাণে হিন্দু দর্শনে বিশ্বাসী, হিন্দুত্বের চর্চা করেন, হিন্দুত্ব রক্ষায় জীবন নিবেদন করেছেন। তাঁদের সেই মহৎ প্রচেষ্টা কোনো প্রচার তো পায়ই না বরং বিকৃত ভাবে সংবাদমাধ্যম তাদের তুলে ধরে যেন হিন্দুদের স্বার্থে কাজ করে তাঁরা মহা অপরাধ করেছেন।

কিন্তু এই সব হিন্দুগোষ্ঠীও একটি ভ্রান্ত ধারণায় ভোগেন। তাঁরা ভাবেন ব্যক্তি-সংযোগ এবং সম্পর্কই আসল কাজ। প্রচারমাধ্যম কেবলমাত্র বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছয়, সব মানুষের কাছে পৌঁছয় না। বস্তুত এ ধারণা ঠিক নয়। এখন টেলিভিশন সর্বত্র গামী হয়েছে। অনেকের বাড়িতেই আছে। যাদের বাড়িতে নেই তারা যেখানে টেলিভিশন আছে সেখানে ভিড় করে। গ্রামের স্ত্রী, পুরুষ এবং ছোট ছেলেমেয়েরাও টেলিভিশন ভক্ত। একথা ঠিক যে ব্যক্তি- সংযোগ এবং সম্পর্ক খুবই ভাল ব্যবস্থা। কিন্তু যুগের প্রভাব তো অস্বীকার করা যায় না। গোরুর গাড়ি এবং পায়ে হাঁটার পরিবর্তে মোটরযান, রেলযান, আকাশযান ব্যবহার যেমন আবশ্যিক হয়ে গেছে, তেমনি ব্যক্তি-সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতির সঙ্গে প্রচারমাধ্যমের সাহায্য গ্রহণও আবশ্যিক হয়ে গেছে। অতি প্রাচীনপন্থী গান্ধীজীও প্রচারমাধ্যমের গুরুত্ব বুঝে— সেই মাধ্যমের সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন। একথা বলা বোধহয় ভুল হবে না যে মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীর মহাত্মা গান্ধী হয়ে ওঠার পিছনে প্রচারমাধ্যমের যা সে যুগে মূলত ইংরাজ ও ইংরাজপন্থীদের হাতে ছিল, তার বিশাল ভূমিকা ছিল। তাই হিন্দুত্ব ও হিন্দুরক্ষায় প্রচারমাধ্যমের সাহায্য পাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিশেষ করে এই সময় যখন প্রচারমাধ্যমগুলি হিন্দু এবং হিন্দুত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচার করছে।

অহিংসা এবং শান্তি শব্দ দু'টি অনেক হিন্দুকে হিন্দুত্ব রক্ষার সংগ্রাম থেকে বিরত রাখে। অহিংসা এবং শান্তি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে হিংসার এবং যুদ্ধর প্রয়োজন তা ভারতবর্ষের মহাভারত এবং রামায়ণ শিখিয়েছে। একান্ত অহিংস এবং সত্যনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকেও যুদ্ধপ্রেরণা দিতে হয়েছিল অর্জুনকে কেবলমাত্র অধর্মকে পরাস্ত করে ধর্মপ্রতিষ্ঠা তথা অহিংসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। পরম ধার্মিক সত্যনিষ্ঠ রামচন্দ্রকেও ধর্মরক্ষায় যুদ্ধে যেতে বাধ্য হতে হয়েছিল। তাঁরা যদি সাম্প্রদায়িক না হন, তবে আজকার হিন্দু একই কাজ করলে সাম্প্রদায়িক হয়ে যাবেন, হিংসার পূজারি হয়ে যাবেন কোন অর্থে?

এই অপপ্রচার, বিকৃত প্রচার, সহিংস প্রচারকে (হিন্দুদের বিরুদ্ধে) মোকাবিলা করার কাজ যদি ক্ষত্রিয় তাত্ত্বিকরা না করেন তাহলে হিন্দু মানবতাবাদী দর্শন অবলুপ্ত হতে সময় বেশি লাগবে না। ভারতবর্ষ নামক সুমহান দেশটিও আর হিন্দুদেশ থাকবে না। আধ্যাত্মিক শক্তি ও ক্ষত্রিয় শক্তিকে একত্রে কাজ করতে হবে। এই আধ্যাত্মিক শক্তি ও ক্ষত্রিয় শক্তির সংযুক্ত প্রতিমূর্তি হলো— তাত্ত্বিক ক্ষত্রিয়।

আমাদের দেশে হিন্দুদের মধ্যে তাত্ত্বিকের কোনো অভাব নেই। অভাব আছে তাত্ত্বিক ক্ষত্রিয়ের। তাত্ত্বিক ক্ষত্রিয়রা নাম, যশ, প্রতিপত্তি এবং অর্থের জন্য কাজ করবেন না বা এগুলির দ্বারা বশীভূত হবেন না বা এগুলির জন্য লোলুপ হবেন না। তাদের কাজ ভোটব্যাংক তৈরি করা নয়। তোষণ এবং তোষামোদে জনপ্রিয়তা অর্জনও তাদের উদ্দেশ্য হবে না। তিনি ধার্মিক হবেন। ধর্ম ও অহিংসা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যুদ্ধ করবেন। মানবতা এবং সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতি তার মূলমন্ত্র।

'সব ধর্মই সমান' তত্ত্বটি হিন্দুরা ব্যতীত আর কেউ মানেন না এবং বিশ্বাস করেন না। তাই তার ধর্মই শ্রেষ্ঠ বলে অন্য ধর্মের লোকেরা যখন হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেন তখন হিন্দুরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন না। যদি কেউ করেন, প্রচারমাধ্যমগুলি তাকে কোণঠাসা করে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে। যে নিজের সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করার জন্য ছল, বল ও কৌশলের আশ্রয় নিল সে সাম্প্রদায়িক হলো না। যে এর বিরোধিতা করল সে আখ্যা পেল সাম্প্রদায়িক বলে। যে খৃস্টান মিশনারীরা হিন্দুদের খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করে চলেছে, তাদের সাম্প্রদায়িক বলা হয় না, কিন্তু যে হিন্দু মিশনারীদের এই কাজে বাধা দেয়, প্রচারমাধ্যমে তাকেই সাম্প্রদায়িক হিন্দু বলে গাল দেয়। মসজিদের জন্য মুসলমানদের লড়াইকে কখনও সাম্প্রদায়িক বলা হয় না, কিন্তু মন্দির রক্ষার সংগ্রাম সবসময়ই 'সাম্প্রদায়িক' যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত হয়েছে।

এই প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন করতেই যুদ্ধ প্রয়োজন। সেই যুদ্ধ করবেন তাত্ত্বিক ক্ষত্রিয় হিন্দুরা। অন্য হিন্দুরা হবেন তার সৈন্য সামন্ত। এই যুদ্ধে প্রচারমাধ্যমগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ক্ষত্রিয় তাত্ত্বিকদের সেই স্থান দখল করতে হবে অথবা তৈরি করতে হবে। কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য নয়, বিস্তার এবং সৃষ্টিশীলতার জন্যও এই কাজ প্রয়োজনীয়। এই ক্ষত্রিয় তাত্ত্বিকদের লক্ষ্য হবে— সমস্ত বিশ্বকে মহান করে তোলা--- কৃণ্বন্ত বিশ্বমার্যম্। আর্য অর্থে— সুসংস্কৃতি যুক্ত।

এই তাত্ত্বিক ক্ষত্রিয়দের প্রথম কাজ হলো নিজেদের তৈরি করা। সৈনাপত্য সাধারণ সৈনিকের কাজ নয়। নিজেদের তৈরি করার অর্থ হলো— হিন্দু দর্শনের মানবতাবাদ, মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিকতায় অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী হতে হবে। অন্যদের সঙ্গে বিতর্ক করার জন্য উপযুক্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, অর্থ ও প্রশংসা লোলুপতা ত্যাগ করতে হবে। তাতে নিশ্চিত হতে হবে যে, অহিংসা ও সত্য প্রতিষ্ঠা করে সুমহান বিশ্ব গঠনের জন্যই তিনি সহিংস যুদ্ধে ব্রতী হয়েছেন। কৃণ্বন্ত বিশ্বমার্যম্ কোনো কথায় কথা নয়।

হিন্দু দর্শনে সমাজ একটি দেহের মতো। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজের নিজের কাজ করে সামগ্রিকভাবে দেহের কল্যাণ সাধণ করে, কিন্তু কেউই তুচ্ছ নয়। একই ভাবে সমাজে বিভিন্ন কাজ ঠিকমত করলে সমাজ সমৃদ্ধ হয় ও সুস্থ থাকে। হাত হাতের কাজ করে, পা পায়ের কাজ, কান, চোখ, মুখ, নাক ইত্যাদি নিজের নিজের কাজ করে, কেউ কারুর কাছে হস্তক্ষেপ করে না। কেউই অপরের থেকে ছোট নয়।

হিন্দু মুনি-ঋষিরা 'মোক্ষ'র ধারণা মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের সর্বদা সদাচারী ও মূল্যবোধ যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। সমস্ত মানুষকেই সাধু-সন্ত বানানোর ব্যবস্থা করেননি। বহু ধরনের মানুষ সমাজে থাকবে এবং সকলের কাজের ফলেই সুস্থ ও সুন্দর সমাজ তৈরি হবে। এই হিন্দু বক্তব্য বা ধারণাকে বিকৃত করা হয়েছে, তার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে ক্ষত্রিয়ের ভূমিকা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষত্রিয়ের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকবে এবং সেই ক্ষত্রিয় হবেন ব্রহ্মজ্ঞান যুক্ত। আজকাল রাজনীতির ক্ষমতায় যারা আছেন— তাঁরা যে কতটা 'ব্রহ্মজ্ঞানযুক্ত ক্ষত্রিয়'তা যে কেউই বিচার করে দেখতে পারেন। আমার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই।

প্রসঙ্গত শুক্লযজুর্বেদ-এর ২০ অধ্যায়ে ২৫নং শ্লোকটি পড়ে দেখা যেতে পারে—

যত্র ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ সমাঞ্চৌ চরতঃ সহ।
তল্লোকং পুণ্যং প্রজ্ঞেয়ং যত্র দেবা সহাগ্নিনা।।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :
Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com
web : www.calcuttawaterproofing.com

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

শিল্পার সাহসকে বাহবা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ‘‘বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি’’— বাঘের সঙ্গে লড়াই চাট্টিখানি কথা নয়। তবু সুন্দরবনের মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য প্রতিনিয়ত বাঘের সঙ্গে লড়াই করে। তারা সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। কিন্তু অষ্টমশ্রেণীতে পড়া ছোট্টমেয়ে শিল্পাও ভয়ঙ্কর এক চিতাবাঘের মুখ থেকে ভাইকে বাঁচানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে সাহসিকতার জন্য ‘জাতীয় পুরস্কার’ পেয়েছে— এটাও কম কথা নয়।

শিল্পাকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।

২০১২ সালের ২৭ অক্টোবরের ঘটনা। অষ্টমশ্রেণীতে পড়ার সময় বাড়ি থেকে দু’ কিলোমিটার দূরে ভাইয়ের সঙ্গে জঙ্গলের পথে প্রতিদিনের মতো সরস্বতী বিদ্যামন্দিরে যাচ্ছিল শিল্পা। ভাই একটু পিছিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ভাইয়ের আর্তচিৎকার শুনে শিল্পা দেখে, ভাইকে ভয়ঙ্কর একটা চিতাবাঘে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নিমেষের মধ্যে শিল্পা ছুটে এসে চিতাবাঘের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিতাবাঘটি তার ভাইকে ছেড়ে দিয়ে শিল্পাকেই আক্রমণ করে বসে। এতটুকু ঘাবড়ে না গিয়ে বইয়ের ব্যাগ দিয়ে বাঘটির মাথায় আঘাত করতে থাকে। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বাঘের হাঁ-মুখে স্কুল ব্যাগটি সর্বশক্তি দিয়ে ঠুসে দিয়ে চিৎকার করতে থাকে। গ্রামের লোকজনকে ছুটে আসতে দেখে চিতা জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে যায়। প্রতিবেশীরা আহত শিল্পা ও তার ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর তারা দু’জনেই সুস্থ হয়ে বাড়িতে আসে।

শিল্পার সাহস দেখে বা চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা শুনে দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা দেখতে আসে। বিলাসপুরের এম এল এ তাদের বাড়িতে এসে শিল্পাকে বাহবা দিয়েছেন। তার মা সরলা শর্মা বলেছেন— আমার মেয়ে ছোট থেকেই খুব সাহসী। ও দেখিয়ে দিয়েছে যে মেয়েরাও কোনো অংশে কম নয়।

প্রধানমন্ত্রীর হাতে সাহসিকতার জন্য পুরস্কার পেয়ে শিল্পা খুবই খুশি। এত সাহস কোথায় পেলে? এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শিল্পা জানায়— ‘‘বাবা-মা ছোটবেলা থেকে সাহসিকতার গল্প শুনিয়েছেন। তাই যে কোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।’’

তোমার ভাই ছাড়া অন্যকেউ হলে তুমি কি করতে? —এক মহিলা সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে নির্ভয়ে সে বলে— ‘‘আমার ভাই শুধু কেন? যে কেউ এরকম বিপদে পড়লে আমি একই ভাবে মোকাবিলা করতাম।’’

গত ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধানমন্ত্রীর হাতে পুরস্কার পাওয়ায় খুশি বিলাশপুরের ভটেড সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের আচার্য- আচার্যারা। তাঁদের কথায়— শিল্পা অঙ্কুরশ্রেণী থেকেই খুব সাহসী। বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় সমস্ত ইভেন্টে সে প্রথম স্থান অধিকার করতো। বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হোত। দশম শ্রেণীতে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সে বর্তমানে ভরাড়ীতে উচ্চমাধ্যমিক সরকারি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-বিভাগে ভর্তি হয়েছে। তার বাবা একটা সংস্থায় সেলসম্যান হিসাবে কর্মরত আছেন। শিল্পার ভাই অঙ্কিত দিদির সাহসিকতায় খুবই গর্বিত। তার কথায়— ‘‘আমিও বড় হয়ে বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পারবো। দিদিই আমার হিরো।’’

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা সুন্দরবন ভ্রমণ করুন ....

বনভূমি ট্রাভেলস্

প্রো ঃ - মৃগাঙ্ক রায়

৯৭৩৪২০৬০৪০ / ৯৮০০৬৮৪২০১

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট,
ক্যানিং টাউন, দক্ষিন ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩২৯
Email : banbhoomitravels@gmail.com

"স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের জনগণ জগতে শ্রদ্ধার আসন লাভ করবার এক সুযোগ পেয়েছে। কারণ জগৎ তাকেই শ্রদ্ধা করে যে বুঝিয়ে দেয়, শক্তিপূর্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত এবং ঐক্যবদ্ধ কাজ — সকলের ত্রাস উৎপাদন করে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

অস্থিরতা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ধ্যানযোগ

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

সাম্প্রতিককালে যে ক'টি অমূল্য গ্রন্থ আমাদের চোখে পড়েছে তার মধ্যে বর্তমান গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৬টি অধ্যায়, ৪টি পরিশিষ্ট এবং কিছু আলোকচিত্র সম্বলিত ২০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি নানা বিষয়ের আকর। তিনি তাঁর গ্রন্থে দু'টি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম আলোচ্য বিষয় হলো— হিন্দুদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা। সব দেশে মেজরিটি সম্প্রদায় অবাধ সুযোগ ভোগ করেন, কিন্তু ভারতে মাইনরিটি খৃস্টান ও মুসলমানেরা বেশি সুযোগ ভোগ করছেন। হিন্দুরা নিজ দেশে পরবাসী। তিনি দেখিয়েছেন যে এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকেরা সরকারের নির্দেশে ভারতের ইতিহাস বিকৃত করে চলেছেন। ফলে বিদ্যালয় স্তর থেকে ছেলেমেয়েরা শিখছে যে আর্যরা দস্যু ছিল ও তারা এসেছিল ভারতের বাইরে থেকে। এঁদের চক্রান্তে মুসলিম ও খৃস্টানদের জোর করে ধর্মান্তর, লুঠ ও অবাধ হত্যা বিষয়টি যথাসম্ভব লঘু করে দেখানো হয়েছে। লেখক বিশেষভাবে দেখিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে কীভাবে স্কুল ও কলেজের পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনী বাদ দেওয়া হয়েছে (দ্রঃ পৃ. ২৯-৩০)। তিনি উদ্ধৃতি সহযোগে দেখিয়েছেন কোরান, হাদিস ও অন্যান্য মুসলিম ধর্মগ্রন্থ জেহাদ, হত্যা, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদিতে উৎসাহ দিয়েছে (দ্রঃ পৃ. ১৮০—১৮৪)। লেখক যথার্থই বলেছেন— 'ইসলাম একটি রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ' (পৃ. ৬)। লেখক লক্ষ্য করেছেন— বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের চিন্তা পরস্পর বিরোধী। তিনি দেখিয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশন তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মাধ্যমে ইসলাম ও

মহম্মদ সম্বন্ধে এমন বক্তব্য রেখেছেন যা ইতিহাস বিরোধী ও হিন্দুবিদ্বেষীদের ভাবনায় ভাবিত (পৃ. ৬)। এমন স্পষ্ট বক্তব্য রাখার জন্য তাঁকে সাধুবাদ দিতে হয়।

শ্রী দাস তপসিলি নেতা যোগেন মণ্ডলের একটি ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি একসময় মনে করতেন মুসলমানেরা তপসিল সম্প্রদায়ের একমাত্র বন্ধু, হিন্দুরা নয়। দেশ স্বাধীন হবার আগেই আম্বেদকর তাঁকে এই সত্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করেছিলেন, কিন্তু যোগেনবাবু তা শোনেননি। পরে পাকিস্তানে মন্ত্রী হয়ে তাঁর জ্ঞানোন্মেষ হয়। এক কাপড়ে তিনি সপরিবারে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। লেখক প্রসঙ্গত একটি সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। লেখকের বক্তব্য হিন্দু ও তপসিল সম্প্রদায় এক সূত্রে গাঁথা। তাঁর মতে ভারতবিদ ম্যাক্সমূলারের বেদ প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিকৃত অনুবাদ দ্বারা খৃস্টধর্ম প্রচারে মিশনারিদের সাহায্য করা। এই অজানা সত্যটি জানানোর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

লেখকের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হলো, বর্তমান ভারত তথা বিশ্বে বস্তুবাদ কীভাবে মানুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এই বস্তুবাদ মানুষের জীবনে অস্থিরতা ও সমূহ চিত্তচাঞ্চল্য এনেছে। এই ব্যাধি থেকে মুক্তির এক মাত্র পথ ও পাথেয় হলো ধ্যানযোগ। লেখক এই গ্রন্থে তা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, ধ্যান দ্বারা সব রকম রোগ এমনকী দুরারোগ্য ড্রাগ ও মাদকাসক্তিও দূর করা যায়। ধ্যান বিষয়ক অংশগুলি না পড়লে বিষয়টি অধিগম্য হবে না। ডাঃ দাস নানান রোগ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেশী বিদেশী চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। বস্তুত গ্রন্থটি লেখকের বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। শ্রী দাস প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে সংস্কৃত অনুবাদ-সহ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এতে পাঠকদের সংস্কৃত জ্ঞান ভাণ্ডার সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়বে। এই গ্রন্থ এক মহা সম্পদ। আমরা এর ব্যাপক প্রচার আশা করি। ২০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির মূল্য তুলনামূলকভাবে কম এবং সেই জন্য ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার উপযোগী।

ডাঃ শংকর দাস। একাগ্রভূমিতে ধ্যানযোগ। প্রকাশক : অখণ্ড ভারত প্রকাশন। কলকাতা, পৃঃ ১৯৭। মূল্য : ২০০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর (আদি) ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার— ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৬।

সমাবেশ সমাচার

বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারীর অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা বৈঠক-২০১৪

গত ১৪, ১৫, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অখিল ভারতীয় বৈঠক সম্পন্ন হলো হুগলী জেলার হরিপালস্থিত 'আরাধনা' ট্রাস্টের মনোরম পরিসরে। পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রের এই প্রথম সাংগঠনিক রচনানুসারে ১৯টি প্রদেশ থেকে মোট ১৪২ জন কার্যকতা (বিভাগস্তর ও তদূর্ধ্ব) ও অধিকারীগণ উপস্থিত ছিলেন। ১০৪ জন পুরুষ ও ৩৮ জন মহিলা প্রতিনিধি ছাড়া বিশেষ অতিথি ও ব্যবস্থাপনাতে আরও ৬০ জন সহ মোট ২০২ জন উপস্থিত ছিলেন। অধিকারীবৃন্দের মধ্যে এ. বালকৃষ্ণণ, বি. নিবেদিতা (সহ সভাপতি), ভানুদাস (সাধারণ সম্পাদক), রেখাদেবী, প্রবীণজী, কিশোরজী (সহ সম্পাদক) এবং কোষাধ্যক্ষ হনুমন্তরাওজী বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আগামী বছর একনাথ রানাডের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রতিটি প্রদেশে কেন্দ্রের কাজকে বিকশিত ও সুদৃঢ় করা, সনাতন ভাবধারা (একনাথজীর অভিপ্রায়)-কে ঘর ঘর পৌঁছে দেওয়া এবং প্রদেশে নীচুস্তর পর্যন্ত কেন্দ্রের কাজকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপক পরিকল্পনার জন্য এই বৈঠকের আয়োজন।

স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশত সমারোহ সমিতির পক্ষ থেকে দু'জন প্রদেশ কার্যকর্তা রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক ও অরবিন্দ দাশকে ওই বৈঠকে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সঙ্ঘের স্থানীয় কার্যকর্তা ও বিবেকানন্দ কেন্দ্র কলকাতার কার্যকর্তাদের একান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতায় ও সুষ্ঠু ব্যবস্থায় প্রতিনিধিরা অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করেন। দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, কালীঘাট, কামারপুকুর, জয়রামবাটী ও সর্বোপরি তারকেশ্বর তীর্থ এবং স্বামীজীর বাসভবনের দর্শনলাভে উপরি আনন্দ উপভোগ করে সকলে উল্লাস ও আনন্দের সঙ্গে নিজ স্থানে ফিরে যান। আগামী বছর একনাথ রানাডের জনশতবর্ষ উপলক্ষে অনেক ধরনের সাহিত্য নির্মাণের বিশেষ কর্মসূচিও দেশব্যাপী নেওয়া হয়েছে।

জৈব কৃষি ও যোগ-প্রাণায়াম প্রশিক্ষণ শিবির

গত ৩১ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ এবং তাঁতিবেড়িয়া স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির পরিচালনায় তিন দিনের জৈব কৃষি ও যোগ-প্রাণায়াম শিবিরটি অনুষ্ঠিত হলো তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরে (হাওড়া জেলা)।

গত ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সভাপতি নন্দলাল কাট, সংগঠন সম্পাদক অনিল রায়, সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সনৎ বসু মল্লিক ও শিবদাস বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম বিকাশ প্রমুখ শংকর মিত্র, যোগ-প্রাণায়াম বিশেষজ্ঞ অসিতবরণ আইচ, তাঁতিবেড়িয়া স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত মাইতি প্রমুখ।

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৫৮ জন কৃষক জৈবকৃষি বিষয়ে শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করেন। যোগ-প্রাণায়াম শিবিরে যোগদান করেন ২৫ জন স্থানীয় নাগরিক, যার মধ্যে মায়েদের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

গত ১ ফেব্রুয়ারি শনিবার জৈব কৃষি বিষয়ে মূল প্রশিক্ষণ প্রদান করেন খড়্গপুর আই আই টি-র প্রশিক্ষক দল। এই দলে ছিলেন জৈবকৃষি বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক ডঃ বি সি ঘোষ, ডঃ ভি কে তেওয়ারী (বিষয়— জৈবকৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার) এবং ডঃ এ কে করণ

(বিষয়— মাটি পরীক্ষা)। এই প্রশিক্ষণে সাহায্য করেন আই আই টি-র জৈবকৃষি বিভাগের ৩ জন কৃতী ছাত্র। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন জৈবকৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দূরদর্শন খ্যাত নগেন্দ্রনাথ বর্মন, জৈবিককৃষি প্রমুখ ভানু থাপা, শংকর মিত্র প্রমুখ। জৈবকৃষিতে অবদানের জন্য ডঃ বি সি ঘোষ, ডঃ ভি কে তেওয়ারী, ডঃ এ কে করণ ও নগেন্দ্রনাথ বর্মন-কে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ ও সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মান ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

অসিতবরণ আইচের পরিচালনায় শিবিরের যোগ-প্রাণায়াম বিষয়টি জৈবকৃষি শিক্ষার্থী ও স্থানীয় নাগরিকদের মধ্যে দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি করে। ২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় হোম-যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিবিরের সমাপ্তি ঘটে।

মঙ্গলনিধি

মালদহ নগরের স্বয়ংসেবক সুইডেনে গবেষণারত বিপ্লব পাল তার শুভ বিবাহ উপলক্ষে প্রীতিভোজ আসরে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের বরিষ্ঠ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার-সহ বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা।

শোকসংবাদ

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি মালদা জেলার কালিয়াচকের বালিয়াডাঙ্গা শাখার স্বয়ংসেবক অমিয়াংশু গুপ্ত-র মা উষা গুপ্ত পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি এক পুত্র, এক কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

গত ২ ফেব্রুয়ারি রবিবার দক্ষিণ ২৪-পরগণার ডায়মন্ড হারবারের বারদ্রোণের স্বয়ংসেবক তাপস সরকারের মাতা মালতী সরকার পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি সঙ্ঘ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর দুই কন্যা, এক পুত্র ও নাতি- নাতনি রেখে গেছেন।

সংস্কৃতভারতী'র অখিল ভারতীয় সমীক্ষা যোজনা বৈঠক

গত ১৩-১৯ ফেব্রুয়ারি সংস্কৃতভারতীর সাতদিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় সমীক্ষা যোজনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো সংস্কৃতাভিমানী স্বামী বিবেকানন্দের তপোভূমি বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বৈঠকে সংস্কৃতভারতীর প্রান্ত সম্পাদক ও সংগঠন সম্পাদক মিলে প্রায় ১০৮ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ দান করেন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রমুখ স্বামী বেদতত্ত্বানন্দ মহারাজ (নিশ্চল মহারাজ)। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম ট্রাস্টি ও সারদা পীঠের সম্পাদক স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজ, কর্ণাটকের সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মল্লেপুরমজী বেঙ্কটেশ, সংস্কৃত ভারতীর অখিল ভারতীয় সভাপতি ডঃ চাঁদ কিরণ সালুজা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত ভাষা আন্দোলনের অন্যতম চমূকৃষ্ণ শাস্ত্রী, দিনেশ কামত, ডঃ নন্দকুমার, আমেরিকার সংগঠক ডঃ পদ্মকুমার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

সংস্কৃত ভাষাকে সমাজের সকল স্তরের মানুষের ব্যবহারিক ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আগামী বছর দেশব্যাপী সমস্ত জেলায় সংস্কৃত সম্মেলনের সংকল্প করা হয় এই বৈঠকে। সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির ছাড়াও সংস্কৃত ভাষা সহজে শেখার জন্য ডাকযোগে 'পত্রাচারসংস্কৃতম্' নামে সকল ভাষায় দেশব্যাপী এক অভিনব অভিযান করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। সপ্তাহব্যাপী সম্পূর্ণ বৈঠক সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। এই সমীক্ষা যোজনা বৈঠকে উপস্থিত থেকে আশীর্বচন প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্বদ্যিালয়ের উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ মহারাজ।

বেলুড়ে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের প্রাক্তন বিদ্যার্থী সঙ্ঘের সম্মেলনে পুরুলিয়া জেলার বুরদা সরস্বতী শিশু মন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র জগন্নাথ মাহাত। জন্ম থেকেই দুই হাত না থাকা জগন্নাথ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। সঙ্গে সঙ্গে দূরশিক্ষা মাধ্যমে এম এ পাঠরত।

দেশে সাক্ষরতা বাড়লেও উচ্চশিক্ষার হার বাড়েনি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশের যেসব ছেলেমেয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মতো হয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পড়ছে। এই তথ্য জানা যাচ্ছে রাজধানীর দুটি গবেষণা সংস্থার প্রতিবেদন থেকে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ অ্যাপ্লায়েড রিসার্চ ইকনমিক রিসার্চ সংস্থার অমিত শর্মা এবং সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডিবেটস ইন ডেভালেপমেন্ট পলিসি সংস্থার আবুসালেহ শরিফ এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন। ভারতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়েই এই প্রতিবেদন। বলা হয়েছে, বিস্তর তফাত রয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে। নারী পুরুষ পার্থক্য তো রয়েছেই, তাছাড়া আছে সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক এবং ভৌগোলিক ব্যাপার। দক্ষিণ ভারতের একজন দলিত বা মুসলমান সামাজিক অনেক বাধা সত্ত্বেও এগিয়ে আসতে পারছে অন্যান্য অঞ্চলের উচ্চবর্ণের হিন্দুর থেকে। খুব খারাপ হলে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের— এই অঞ্চলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের হার বেশ করুণ। এই অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছে উত্তর-মধ্য অঞ্চল, এর সঙ্গে রয়েছে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল। দক্ষিণ ভারত এবং উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যের অবস্থা অনেকটা ভালো। জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, দিল্লীর শিক্ষা-চিত্র তুলনামূলকভাবে উন্নত।

বনবাসী ও দলিতদের মধ্যে মাত্র ১.৮ শতাংশ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। মুসলমানদের মধ্যে নিচ্ছে ২.১ শতাংশ। গ্রামীণ জনসমষ্টির ২ শতাংশ উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। ২২-৩৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের উত্তর অঞ্চলে ১৫ শতাংশ আর দক্ষিণ অঞ্চলে ১৩ শতাংশ উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে পারছে। উত্তর-মধ্য অঞ্চলে মাত্র ১০ শতাংশ পুরুষ আর ৬ শতাংশ নারী উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। উত্তরপূর্ব অঞ্চলে সেই হার দাঁড়াচ্ছে ৮ শতাংশ পুরুষ ৪ শতাংশ নারী। এই প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে ২০০৭-০৮ সালের নমুনা সমীক্ষাকে ভিত্তি করে। ন্যাশনাল স্যাম্পেল সারভে অরগানাইজেশন (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা) থেকে যেসব তথ্য মিলেছে তাতে দেশের শিক্ষাচিত্র ওইভাবে ধরা পড়েছে। দেখা যাচ্ছে বিস্তর পার্থক্য রয়ে গেছে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে। নারীপুরুষদের সঙ্গে আছে ধর্মীয় ও আঞ্চলিক বৈষম্য। তপসিলি আর দলিতদের মধ্যে ১.৮ শতাংশ উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। মুসলমানরা ২.১ শতাংশ উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ দেখাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে ২ শতাংশ উচ্চ-মাধ্যমিক পাঠ নিচ্ছে শহরে সেটা দাঁড়াচ্ছে ১২ শতাংশ। ৩ শতাংশ নারী কলেজে পড়তে যাচ্ছে। আর ৬ শতাংশ পুরুষ। দক্ষিণ ভারতের চিত্রটা একটু উন্নত। সেখানে উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তি শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যমে শেখার আগ্রহ বেশ ভালো। *(সারণী দ্রষ্টব্য)* তপসিলি সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে ২২ শতাংশ দক্ষিণ ভারতে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। মুসলমানরা নিচ্ছে ২৫ শতাংশ। দক্ষিণ ভারতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এটাই সব থেকে কম হার। তবে সেটা উত্তর ভারতের অন্যান্য জাত ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের থেকে বেশি। দক্ষিণ ভারতে বেসরকারি ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের হার ভালো। ৪২ শতাংশ। পশ্চিমাঞ্চলে সেটা ২২ শতাংশ। উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রায় সবাই সরকারি বেসরকারি সাহায্যপুষ্ট স্কুলে শিক্ষা নিতে আগ্রহী।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর মধ্য অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সুবিধের ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। মধ্য অঞ্চল— ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার দিকে নজর দেওয়া দরকার। আমাদের দরকার কয়েক হাজার এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেখানে তরুণ সমাজ পেশাগত পাঠ নিয়ে দক্ষতা বাড়াতে পারবে এবং কাজের সুযোগ পাবে।

সারণী

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির পাঠ নিচ্ছে কত শতাংশ ছাত্রছাত্রী

অঞ্চল	হিন্দু এসসি এসটি	মুসলমান	হিন্দু ওবিসি	হিন্দু উচ্চ-জাতি	অন্যান্য সংখ্যালঘু
দক্ষিণ	২২	২৫	৩৭	৩৮	৩৩
উত্তর	১১	৮	২১	২২	৩৫
উত্তর মধ্যাঞ্চল	৪	৮	১৩	১৯	৭
মধ্যাঞ্চল	১৭	১৬	১৩	২৬	২১
পশ্চিমাঞ্চল	১৭	১৭	২০	২৭	৮
উত্তরপূর্ব	১	৬	৯	৫	৫

কত শতাংশ ছাত্রছাত্রী উচ্চস্তর পাঠ নিচ্ছে

অঞ্চল	হিন্দু এসসি এসটি	মুসলমান	হিন্দু ওবিসি	হিন্দু উচ্চ-জাতি	অন্যান্য সংখ্যালঘু
দক্ষিণাঞ্চল	৭	৮	১২	২৬	২৩
উত্তর	৭	৭	১১	২৬	১২
উত্তর মধ্যাঞ্চল	৪	৩	৬	২০	১৫
মধ্যাঞ্চল	৩	৫	৬	২৫	১০
পশ্চিমাঞ্চল	৫	৭	৯	২৫	২৮
উত্তরপূর্ব	৩	৩	৬	১৩	৮

বিজয়, লিয়েন্ডার, মহেশের উত্তরসূরি নন সোমদেব

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এটিপি চ্যালেঞ্জার টেনিস টুর্নামেন্ট। ৫০ হাজার ডলার পুরস্কার মূল্যের এই টুর্নামেন্টে বিশ্বের প্রথম একশোয় থাকা কয়েকজন টেনিস তারকা খেলতে এসেছিলেন। বিটিএ কমপ্লেক্স যা কিনা সল্টলেক স্টেডিয়ামের মধ্যে গড়ে উঠেছে সাতদিন ধরে সেখানে চলল অত্যন্ত উঁচু মানের টেনিস। এসেছিলেন রাশিয়ার ইভজেনি ডনস্কয়, আলেকজান্ডার কুদ্রিয়াভসেভ, কাজাখস্তানের আলেকজান্ডার নেডোভাইয়েসেভ, রজার ফেডেরারের সঙ্গে ডেভিসকাপে লকাররুম শেয়ার করা মার্কো চিউডিনেল্লি, সার্বিয়ার নোভাক ডকোভিচের পাটনার বোজোলিয়াক প্রমুখ। শেষ পর্যন্ত ফাইনালে বোজোলিয়াক রাশিয়ার ডনস্কয়কে ৬-১, ৬-১-এ হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন ও কলকাতাবাসীর হৃদয় জয় করে ফিরলেন। আর ডাবলস ফাইনালটা হলো অল ইন্ডিয়ান ইভেন্ট। সাকেত মিনেমি সনম সিংহ জুড়ি স্বদেশীয় বিষ্ণুবর্ধণ ও দ্বিবীজশরণকে হারিয়ে প্রথম খেতাব জিতলেন।

কলকাতায় এর আগে বড় বড় ডেভিসকাপ ম্যাচ হয়েছে। খেলে গেছেন বিশ্বের সেরা সব টেনিস খেলিয়ে দেশ ও বড় বড় চ্যাম্পিয়নরা। কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরে এতবড় টুর্নামেন্ট এর আগে কখনো হয়নি। সেদিক থেকে দেখলে এই

টুর্নামেন্ট কলকাতার টেনিস ঐতিহ্য ও সম্ভ্রমকে আরো একবার তুলে ধরতে পেরেছে। কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিকোণে কতটা কি লাভ হলো, তার মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। সোমদেব দেববর্মন এখনো গ্রান্ডস্লামে প্রথম কি দ্বিতীয় রাউন্ডের বাঁধ টপকাতে পারেননি। এটিপি টুর সার্কিটেড একই অবস্থা। এখন দেখা যাচ্ছে দেশের মাটিতে প্রবল জনসমর্থন মাথায় নিয়েও এটিপি চ্যালেঞ্জার টুর্নমেন্টেও চাপ নিতে ব্যর্থ। আরেকজন উঠতি তারকা উকিভামব্রি কোয়ার্টার ফাইনালেই বিদায় নিয়েছেন। সোমদেব অবশ্য দুই শক্তিধর বিদেশী প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন।

বিজয় অমৃতরাজ একবার বলেছিলেন সোমদেব সিঙ্গলসে ভারতের টেনিস পতাকা এটিপি সার্কিটে উঁচু করে তুলে ধরার জন্যই এসেছেন। কিন্তু এযাবৎকালের মধ্যে তার যথার্থতা মেলে ধরতে পারেননি তিনি। সেই কবে ২০০৯-এ চেন্নাই এটিপিতে ফাইনালে উঠেছিলেন। তারপরে আর বলার মতো সাফল্য কই? ২০১০ র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম একশোয় ঢুকে পড়েন। এক সময় ডট র‍্যাঙ্কিং নিয়ে সার্কিটে বিরাজ করেছেন। বেশ কিছু এটিপি টুর্নামেন্টে প্রিকোয়ার্টার বা কোয়টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছেন। তারপর ক্রমশই পিছিয়ে পড়া। এখন যা বয়স এর মধ্যে যদি তুল্যমূল্য সাফল্য না পান তবে ভারতের টেনিস ইতিহাসে পাকাপাকি স্থান পাওয়া আর বোধহয় সম্ভব হবে না। অথচ মার্কিন মুলুকে ছোট থেকে বেড়ে ওঠা, টেনিস প্রশিক্ষণ সব কিছু সত্ত্বেও সোমদেবের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তেমনভাবে দাগ কাটতে না পারার কোনো ব্যাখ্যাই নেই। এই কলকাতায় এটিপি চ্যালেঞ্জারে তার চাম্পিয়ন হওয়া উচিত ছিল। সবরকম সুযোগ সুবিধে পেয়েও সেমিফাইনালে আটকে যাওয়াটা মোটেই সুবিচার নয় তার টেনিস সত্তার পক্ষে।

ডাবলসেও সোমদেব-উকিভামব্রি জাল ফেলতে পারেননি। বিশ্ব টেনিসে ডাবলসে অন্তত ভারতের বড় মুখ করে গর্ব করার অবকাশ আছে। এখনো এই বয়সে লিয়েন্ডার গ্রান্ডস্লাম জিতছেন। মহেশ ভূপতিও মাঝেমধ্যে চমক দিচ্ছেন। রোহন বোপান্নাও পাকিস্তানি সঙ্গী আইসাম কুরেশিকে নিয়ে এটিপি জিতবেন বলে ধরে নেওয়া যায়। আর ডেভিসকাপে সিঙ্গেলস-ডাবলস মিলিয়ে ভারতের হয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ জিতেছেন বিজয় অমৃতরাজ, লিয়েন্ডার পেজ। সোমদেবের মধ্যেও বিজয় বা লিয়েন্ডার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। দু-একটা মহার্ঘ সিঙ্গলস ম্যাচ জেতা ছাড়া সোমদেবের মুকুটে তেমন উজ্জ্বল পালক শোভা পাচ্ছে না। তার একার কৃতিত্বে ভারতকে এলিট গ্রুপে তোলার মতো চওড়া কাঠ হয়ে ওঠা হয়নি সোমদেবের। যেটা করে দেখিয়েছেন লিয়েন্ডার, মহেশ-ভূপতিরা। বিজয়, আনন্দ অমৃতরাজ তার পরে রমেশকৃষ্ণন ভারতীয় টেনিসকে বিশ্বমঞ্চে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন লিয়েন্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি। সোমদেব, ভামব্রিরা কিন্তু সেই পতাকা নামিয়ে আনছেন।

পুনশ্চ : কলকাতার চ্যালেঞ্জারের ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার পরেই দিল্লীতে এক লক্ষ মার্কিন ডলার পুরস্কার মূল্যের এটিপি চ্যালেঞ্জার টুর্নামেন্ট থেকে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে চার ধাপ এগিয়ে থাকা কাজাখস্তানের আলেকজান্ডার সেডো ভায়েসেভকে ফাইনালে ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। প্রমাণ করলেন কলকাতার সেমিফাইনালে আটকে যাওয়াটা নেহাতই এক দুর্ঘটনা। এটিপি চ্যালেঞ্জার টুর্নামেন্টে সোমদেব এখনও নিজের জাত চেনাতে সক্ষম। এপর্যন্ত সোমদেব তিনটি (এটিপি) চ্যালেঞ্জার জিতেছেন তবে বিশ্ব টেনিসের আলোকিত আসরে গেলে তাকে শুধু চ্যালেঞ্জারে আটকে থাকলে চলবে না এটিপি এবং গ্ল্যান্ডস্লামে অনেক কিছু করে দেখাতে হবে যেমনটা দেখিয়েছেন বিজয় অমৃতরাজ, লিয়েন্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতিরা।

শব্দরূপ-৭০৪ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
■	৫		■	৬		৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮			৯	■	১০		■
■	■	■	১১			■	১২
১৩				■	১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর হরিভক্ত পুত্র, **৩.** 'হাস্যমুখে অদৃষ্টরে করব মোরা —', **৪.** নৌকার সম্মুখে বা পিছনের সরু অংশ, **৫.** যুগল, **৬.** কার্তিকেয় যিনি তারক নামের অসুরকে বধ করেন, **৮.** 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হলো—/ লেখা আছে অশ্রুজলে', **১০.** বধির শ্রীকৃষ্ণ, **১১.** গৌরব, গুরুত্ব, **১৩.** রক্তপদ্ম, **১৪.** প্রচারক।

উপর-নীচ : **১.** 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো—', **২.** গোরুর গাড়ির চাকার দাগ; কশাঘাতের দাগ, **৩.** উপনয়ন, **৫.** কোনো প্রকারে কাজ চালাবার যোগ্য করা; গোঁজামিল, **৭.** জ্যোতিষে অশুভ সময়, **৯.** আজ—, কাল ধার, **১০.** গৌহাটি'র নিকট পর্বত (মহাপীঠ) এবং সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, **১২.** প্রেত বিশেষ যে মাটির নিচে পোঁতা ধন আগলায়; যক্ষ।

সমাধান
শব্দরূপ-৭০১
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

খো	■	■	পু	ষ্প	শ	র	■
ক্ক	■	■	ল	■	মি	■	■
স	ত্যা	গ্র	হ	■	তা	র	ক
■	জ্য	■	■	■	■	ক্ষা	■
■	পু	■	■	■	■	কা	■
চি	ত্র	ক	■	রা	স	লী	লা
■	■	ব	■	ব	■	■	ল
■	আ	চ	র	ণ	■	■	সা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭০৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৭ মার্চ, ২০১৪ সংখ্যায়

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের

ভাজা সামুই ব্যবহার ক(নে
মাত্র দুই মিনিটে (ৈর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

আজ দেশে শক্তিশালী ও মজবুত সরকার চাই

ভোটদান অবশ্যই করুন
দেশের জন্য ভোটদান করুন।।

আপনার একটি ভোট দেশের জন্য
আপনার একটি ভোট পরিবর্তনের জন্য

যদি পরিবর্তনের পক্ষে হন তাহলে আপনার ভোটার কার্ডের নম্বরটি এই নম্বরে এস এম এস করুন— ০৯২২৩০০৯০০০

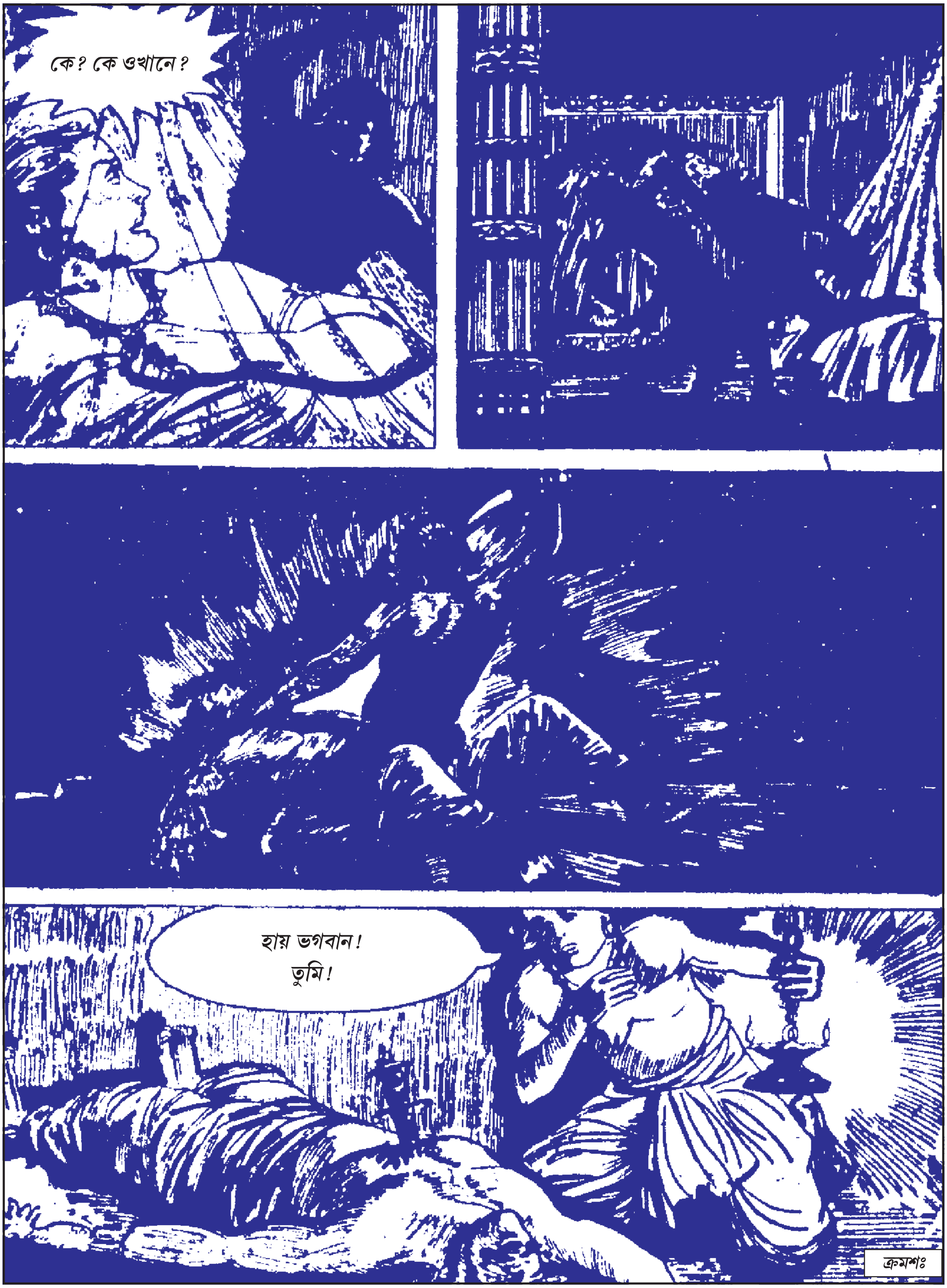
কে? কে ওখানে?
হায় ভগবান! তুমি!
ক্রমশঃ

লোকসভা ভোটে নতুন ২.৩ কোটি ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কমপক্ষে ২.৩ কোটি নতুন ভোটার ২০১৪-র লোকসভা ভোটে ভোটার তালিকায় যুক্ত হলো, যাদের বয়স ১৮ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। ২০১৩-তে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে ৯৩ লক্ষ এবং ২০১২-তে ১.০৯ কোটি। ১৯ বছরের কম বয়সের ভোটাররা সারা দেশের নির্বাচকমণ্ডলীর ২.৮ শতাংশ। রাজ্য অনুযায়ী এই নতুন ভোটারদের হার সবচেয়ে বেশি দাদরা ও নগর হাভেলিতে ৯.৯ শতাংশ। ঝাড়খণ্ডে ৯ শতাংশ, দমন-দিউ-এ ৮.৬ শতাংশ। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লীর ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরিতে এই নতুন ভোটার যথাক্রমে ১.১ শতাংশ, ১.৩ শতাংশ, ১.৪ শতাংশ ও ১.৯ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশে ১৮-১৯ বছর বয়সের নতুন ভোটার সবচেয়ে বেশি ৩৮ লক্ষ। তারপরেই পশ্চিমবঙ্গে ২০.৭৯ লক্ষ।

রাজ্যে রাজ্যে ভারতীয় ভোটারদের সংখ্যা

ভোটদাতা নারী পুরুষের সংখ্যার মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য। পুরুষ ৪২ কোটি ৬৫ লক্ষ। শতাংশের হিসেবে ৫২ শতাংশ। আর নারীরা আছেন ৩৮ কোটি ৭৯ লক্ষ। শতাংশ হিসেবে ৪৭.৬ শতাংশ। অন্যরা ২৮ হাজার, ৩৪১। শতাংশের হিসেবে ০.০০৩ শতাংশ। তুলনায় কম মহিলা ভোটার রাজধানীতে। ৪৪.৫৭ শতাংশ। এরপর রয়েছে উত্তরপ্রদেশ ৪৫.২০ শতাংশ।

কোথায় কোথায় পুরুষরা কম রয়েছে জাতীয় অনুপাত থেকে : পুদুচেরি ৪৮.৫২ শতাংশ, কেরলের অবস্থা একই ৪৮.৫২ শতাংশ। মিজোরাম আর দমন ও দিউতে এই হার ৪৯.৫১ শতাংশ। গোয়া আর অরুণাচলপ্রদেশ একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে : ৫০.৫০ শতাংশ। অন্য ভোটাররা সবচেয়ে বেশি কর্ণাটকে ৮,৪৫৩। এরপর উত্তরপ্রদেশ ৬,৬৩০ জন।

ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর কাছ থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। ইলেকশন কমিশনের কাছ পাওয়া খতিয়ানের ভিত্তিতে যা তৈরি। দেশে মোট ভোটার ৮১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৯১ হাজার ১৮৪ জন। ২৮টি রাজ্যে রয়েছে ৯৮.২৭ শতাংশ ভোটার। উত্তরপ্রদেশ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এগিয়ে। সিকিমে ভোটার সব থেকে কম। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের মধ্যে ৭টিতে ভোটার ১.৭৩ শতাংশ।

রাজে রাজ্যে ভোটারদের সংখ্যা

অন্ধ্রপ্রদেশ	—	৬,২৩,৮৫,৯৪৯
অরুণাচলপ্রদেশ	—	৭,৫৩,২১৬
অসম	—	১,৪৭,২৩,০৩২
বিহার	—	৬,২১,০৮,৪৪৭
ছত্তিশগড়	—	১,৭৫,২১,৫৬৩
গোয়া	—	১০,৪৩,৩০৯
গুজরাট	—	৩,৯৮,৭১,৫৭১
হরিয়ানা	—	১,৫৫,৯৪,৪২৭
হিমাচলপ্রদেশ	—	৪৬,৭৪,১৮৭
জম্মু ও কাশ্মীর	—	৬৯,৩৩,১১৮
ঝাড়খণ্ড	—	১,৯৯,৪৮,৬৮৩
কর্ণাটক	—	৪,৪৬,৯৪,৬৫৮
কেরল	—	২,৩৭,৯২২৭০
মধ্যপ্রদেশ	—	৪,৭৫,৪৪,৬৪৭
মহারাষ্ট্র	—	৭,৮৯,৬৬,৬৪২
মণিপুর	—	১৭,৯৩,০০৫
মেঘালয়	—	১৫,৫৩,০২৮
মিজোরাম	—	৬,৯৬,৪৪৮
নাগাল্যান্ড	—	১১,৭৪,৬৬৩
ওড়িশা	—	২,৮৮,৮০,৪০৩
পাঞ্জাব	—	১,৯২,০৭,২৯০
রাজস্থান	—	৪,২৫,৫৯,৫৪৩
সিকিম	—	৩,৬২,৩২৬
তামিলনাড়ু	—	৫,৩৭,৫২,৬৪২
ত্রিপুরা	—	২৩,৭৯,৫৪১
উত্তরপ্রদেশ	—	১৩,৪৩৫১,২৯৭
উত্তরাখণ্ড	—	৬৭,৪৬,৩৯৪
পশ্চিমবঙ্গ	—	৬,২৪,৬৮,৯৮৮

জাতীয়তাবাদী
বাংলা সংবাদ
সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য
৪০০ টাকা

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
3 March - 2014

দাম : ১০.০০ টাকা